অন্তর্যোগ

অনির্বাণ

অন্তর্যোগ

অনির্বাণ

ANTARYOGA

(By Anirvan)

রচনা-কাল : বাংলা ১৩৬৩-৬৫ (ইংরাজী ১৯৫৬-৫৮)

প্রথম প্রকাশ—রথযাত্রা, ১৩৮৭, দ্বিতীয় মুদ্রণ—গুরুপূর্ণিমা, ১৩৯২,
তৃতীয় মুদ্রণ—ঝুলনপূর্ণিমা, ১৪০৪

প্রকাশক

শ্রীগৌতম ধর্মপাল

হৈমবতী প্রকাশনী

৯/২ ফার্ন রোড, কলিকাতা—১৯

পরিবেশক

(১) **শ্রীঅরবিন্দ পাঠমন্দির**

১৫, বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা—৭৩

(২) **উদয় সংঘ,** ১৭ বারুইপাড়া লেন, হাওড়া—৪

প্রধান বিক্রেতা

মহেশ লাইব্রেরী

২/১ শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট

কলিকাতা—৭৩

মুদ্রক

শ্রীঅজিত চৌধুরী

সাধনা প্রেস

৪৫/১ এফ, বিডন স্ট্রীট

কলিকাতা—৬

সর্বস্বত্ব—**হৈমবতী প্রকাশনী**

মূল্য—২০·০০ টাকা

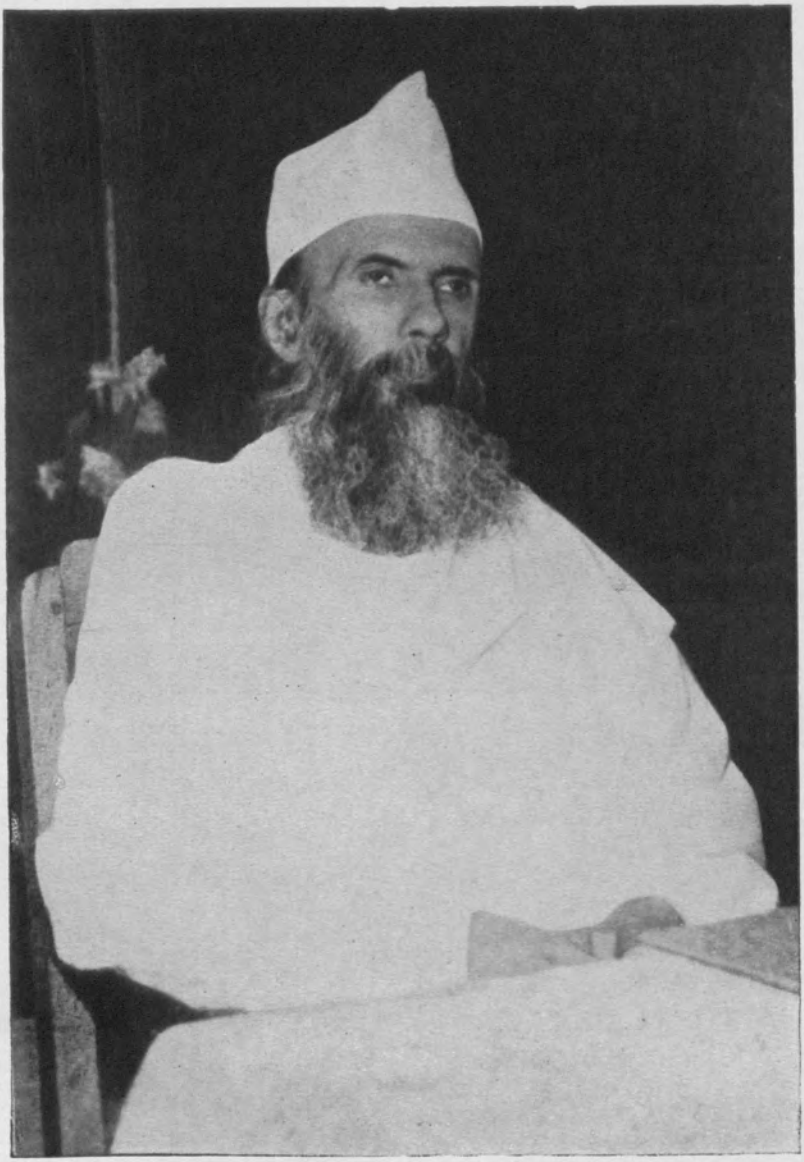

অনির্বাণ

নিবেদন

'হৈমবতী প্রকাশনী' চির-অনির্বাণ জ্ঞানের আলো জগতে ছড়িয়ে দেবার এক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন প্রধানতঃ এবং প্রথমতঃ শ্রীমৎ অনির্বাণের সমস্ত রচনা একে একে সাধ্যমত প্রকাশ ক'রে।···

'হৈমবতী' এই নামটি তাঁর বড় প্রিয় ছিল, কারণ হৈমবতীই ছিলেন তাঁর ইষ্ট, তাঁর আরাধ্য, তাঁর নিবাস। বহুশোভমানা এই উমা তাঁর সোনার বুকখানি মেলে ধরেছিলেন তাঁর কাছে এবং সেই হিরণ্যদ্যুতির বিদ্যোতনে তাঁর চিত্তাকাশের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল। তারই বিদ্যুদ্দীপ্তি ঠিকরে ঠিকরে পড়েছে তাঁর প্রতিটি লেখায়। ফলে 'দুর্বাখ্যাবিষ-মূর্চ্ছিতা' বেদবাণী আবার কথা ক'য়ে উঠল তাঁর 'বেদমীমাংসা'য়; উপনিষদের নিগূঢ় রহস্য উদ্‌ঘাটিত হল তাঁর 'উপনিষৎ-প্রসঙ্গে'; গীতার মর্মার্থ সকলের গোচর হ'ল তাঁর 'গীতানুবচনে'; যুগর্ষি শ্রীঅরবিন্দের দিব্য নব-ভাবধারার কঠিন আবরণ ভেঙ্গে গেল তাঁর 'দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ', 'যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ' ইত্যাদির মাধ্যমে। তেমনি তাঁর 'প্রবচন', 'প্রশ্নোত্তরী', 'পত্রলেখা'য় কত জিজ্ঞাসুর হয়েছে সংশয় নিরসন, অবসাদ বিদূরণ ও লক্ষ্যের প্রোদ্‌ভাসন।···

"অন্তর্যোগ" অনির্বাণ-রচনাবলীর পরবর্তী সংযোজন। এই রচনাগুলি পূর্বে আনন্দময়ী-আশ্রম থেকে প্রকাশিত ত্রৈমাসিক **"আনন্দবার্তা"** পত্রিকার ৫ম (১-৪), ৬ষ্ঠ (১, ৩), ৭ম (২) ও ৮ম (১) খণ্ডে ইংরাজী ১৯৫৬-৫৮ সালে ছাপা হয়েছিল। এ বিষয়ে অনির্বাণজীর আরও রচনা এখনও সংগৃহীত হয়নি। সংগৃহীত হলে পরবর্তী সংস্করণে অন্তর্ভুক্ত হবে।

এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি রচনা ও আদ্যোপান্ত পরিমার্জনায় বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় আন্তরিক সাহায্য করেছেন—এজন্য কৃতজ্ঞতা জানাই।

কলিকাতা
রথযাত্রা, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ

প্রকাশক

লেখক-পরিচিতি

জন্ম—১৮৯৬ (২৪ আষাঢ়, ১৩০৩) **মহাপ্রয়াণ**—১৯৭৮ (১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৩৮৫)

অনির্বাণ—মরমী বেদভাষ্যকার, মনীষী অধ্যাত্মপুরুষ। ১৩০৩ সনের (ইং ১৮৯৬) ২৪শে আষাঢ় মৈমনসিংহে জন্ম। পূর্বনাম নরেন্দ্রচন্দ্র ধর। পিতা ডাক্তার রাজচন্দ্র ধর ও মাতা সুশীলাদেবী। ঢাকা ও কলিকাতায় কঠোর ছাত্রজীবন যাপন করে ম্যাট্রিকে বৃত্তিলাভ এবং বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় সংস্কৃতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। পিতা সপরিবারে সংসার ত্যাগ করে শ্রীমৎ স্বামী নিগমানন্দের আশ্রয় গ্রহণ করেন। নরেন্দ্রচন্দ্রও তাঁর কাছে ১৯১৪ সালে ব্রহ্মচর্য ও ১৯২৭ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। সন্ন্যাস-নাম শ্রীমৎ স্বামী নির্বাণানন্দ সরস্বতী। আসামের কোকিলামুখ-স্থিত 'আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠে' সুদীর্ঘ বারো বৎসর পরিচালক, ঋষি-বিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও পরে আচার্য এবং 'আর্যদর্পণ' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

১৯৩০ থেকে স্বাধীন পরিব্রাজক সন্ন্যাসীরূপে হিমালয়ের বিভিন্ন স্থানে নিভৃতে সাধনা করেন। আলমোড়ায়, বালক-বয়সে দৃষ্ট জীবন-দেবতা হৈমবতী বা বেদময়ী বাকের পূর্ণ উদ্ভাস লাভ করে বেদকে সমগ্র ভারতীয় সাধনা, দর্শন ও সংস্কৃতির মূলাধাররূপে দর্শন করেন। তাঁর বাকি জীবন এই সত্যদর্শনেরই বিবৃতি। এই মহাসমন্বয়ের উপলব্ধিকে বিস্ময়কর পাণ্ডিত্যপূর্ণ পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে মণ্ডিত করে শিলঙে রচনা করেন মহাগ্রন্থ 'বেদ-মীমাংসা', যা পরে রবীন্দ্রপুরস্কার লাভ করে। শ্রীঅরবিন্দের মধ্যে উপলব্ধ সত্যের প্রতিফলন দেখে বেদভাষ্যের সঙ্গে সঙ্গে অরবিন্দ-ভাষ্য রচনাও তাঁর জীবনের অন্যতম

ব্রত হয়ে দাঁড়ায়। তাঁর Life Divine-এর অনুবাদকে শ্রীঅরবিন্দ 'A living translation' বলে অভিনন্দিত করেন।

১৯৬৪ সাল থেকে তিনি কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে সুরু করেন এবং বৈদিক ও অরবিন্দ-সাহিত্য সম্পর্কে নিয়মিত প্রবচন, উপনিষদ্-ভাষ্য রচনা, প্রশ্নোত্তর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে উপলব্ধ জীবন-সত্যকে প্রকাশ করে চলেন।*

বাইরে শীর্ণ তপস্বীমূর্তি, ভেতরে রসাবিষ্ট অনির্বাণ ছিলেন অন্তরে অন্তরে বাউল। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁর প্রাণপুরুষ। তিনি মনে করতেন, বৈরাগ্য ও প্রেম এই উভয়ের যুগনদ্ধতাই জীবনের মহত্তর শিল্প।

ভারত-বন্দনা-রূপ সঙ্কল্পিত তাঁর ভারত-পরিক্রমা ১৯৬৭-তে কেদার-বদ্রিনাথে সমাপ্ত হয়। ১৯৭১-এ আকস্মিক পতনজনিত আঘাতের ফলে গুরুতর ব্যাধিগ্রস্ত হন। ঐ অবস্থাতেও বহু স্বদেশী ও বিদেশী অধ্যাত্মপিপাসু ও জ্ঞানার্থীর আশ্রয়স্থল ছিলেন। ১৯৭৮-এর ৩১শে মে পরলোকে প্রয়াণ করেন।

—গৌরী ধর্মপাল

---

* অনির্বাণ-রচিত গ্রন্থাবলীর তালিকা ৮১ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য।

সূচী

				পৃষ্ঠা
১	অষ্টাঙ্গ যোগ :	বহিরঙ্গ	....	১
২	অষ্টাঙ্গ যোগ :	অন্তরঙ্গ	....	৬
৩	জপযোগ :	চতুরঙ্গ	....	১০
৪	ধারণাযোগ :	ত্রিদেশ-চতুশ্চক্র	....	১৬
৫	মন্ত্রযোগ :	অজপাজপ-রহস্য	....	২০
৬	ধারণা-যোগ :	দৈহ্য-বৈদেহ্য	....	২৯
৭	ধ্যানযোগ :	ত্রি-অঙ্গ	....	৩৬
৮	সমাধিযোগ :	ভাব ও ভাবনা	....	৪৫
৯	যোগ :	বহিরঙ্গ থেকে অন্তরঙ্গ	....	৫৪
১০	সালম্বন যোগ :		....	৬৭
১১	নিরালম্ব যোগ :	নিদ্রাযোগ	....	৭৬

———

১

ভূমিকা

অষ্টাঙ্গ যোগ ঃ বহিরঙ্গ

যোগের আটটি অঙ্গকে দুভাগে ভাগ করা হয়েছে,—যম, নিয়ম, আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার এই পাঁচটিতে যোগের বহিরঙ্গ, আর ধারণা-ধ্যান-সমাধি এই তিনটিতে অন্তরঙ্গ। বহিরঙ্গ সাধনায় চিত্ত ক্রমশঃ অন্তর্মুখ হয়। চিত্তের প্রশান্তি প্রসাদ ও অন্তর্মুখীনতা সব এক সূত্রে গাঁথা। সূক্ষ্ম চিত্তসত্ত্ব আমার সত্তার গভীরে যেন বিদ্যুতের বিন্দু বা তন্তুর মত। তারই আলো বাইরে ছড়িয়ে পড়ে আমার জগৎ সৃষ্টি করছে—যেমন বাইরের জগৎ, তেমনি অন্তরের জগৎ। দুটি জগতেই সব সময় নানারকম বিক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে। তাতে উপনিষদের ভাষায় জীব 'পরাক্ পশ্যতি, নান্তরাত্মন্'—দেখছে কেবল বাইরের দিক্‌টাই, ভিতরে আত্মার দিকে তাকাচ্ছে না। ভিতরের দিকে তাকানোর অভ্যাসই হল যোগের সাধনা।

প্রথমতঃ বাইরেটা গুছিয়ে নিতে পার, ওখানকার ঝামেলা কমলে তবে চিত্ত ভিতরের দিকে যাবে। কিন্তু বাইরেটা গোছাবার জন্য পরের ওপর নির্ভর করলে চলবে না। অর্থাৎ সংসারে অপরের ক্রিয়া বদলাবার চেষ্টা না করে নিজের প্রতিক্রিয়াগুলো বদলাবার চেষ্টা করতে হবে। বাইরের জগতের সম্পর্কে নানাভাবে আসতে হলেও চিত্তের সমতাকে বজায় রাখবার যে সাধনা, তাই হল যম। তার ফলে বহির্জগতের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ সুসমঞ্জস হয়—আমার অন্তরের

দিক্ থেকে। যোগের ভাষায় বাইরের জগতে ছড়িয়ে পড়েছে আমার যে চিত্তের আলো, তা প্রশান্ত, প্রসন্ন ও স্বচ্ছ হয়।

এমনি করে অন্তর্জগতের আলোকে প্রসন্ন করবার সাধনা হল নিয়ম। তার মধ্যে তপঃ স্বাধ্যায় আর ঈশ্বরপ্রণিধানের সাধনাই সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এমন কি সাধারণ লোকের পক্ষে এই তিনটিতেই যোগের চরম অঙ্গ যে সমাধি, তাও লাভ করা সম্ভব।

যম-নিয়ম সিদ্ধ হলে চিত্ত সব সময় প্রীতি ও আনন্দে পূর্ণ থাকে, অসত্য সঙ্কল্প কখনও মনে জাগে না, যোগ-ক্ষেমের ভাবনা থাকে না, অপূর্ব বীর্যে হৃদয় পূর্ণ হয়, আমার জীবনে দেবতার কোন্ ব্রত সিদ্ধ হবে তা' স্পষ্ট হয়ে ওঠে, দেহাত্মবোধ নষ্ট হয়ে যায়, দেহ এবং ইন্দ্রিয়ের শক্তি স্বচ্ছ ও অপ্রতিহত হয়, ইষ্টকে সব সময় মনে হয় বুকের মাঝে, আর সমস্ত কাজকর্মের মধ্যেও একটা অপূর্ব তন্ময়তায় হৃদয় যেন আবিষ্ট হয়ে থাকে।

এই লক্ষণগুলো ফুটলে তবে বুঝতে হবে এইবার যোগে অধিকার জন্মেছে, আমার বাইরের আর অন্তরের জগৎ স্বচ্ছ হয়ে গেছে।

এরপর জগৎ হতে দৃষ্টিকে আরও গভীরে নিজের মধ্যে নিয়ে যাবার জন্য দেহ, প্রাণ আর মনের সাধনা।

দেহকে অর্থাৎ দেহবোধকে সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্বিকার করবার জন্য আসনের সাধনা। প্রযত্নশৈথিল্য (relaxation) আর অনন্তসমাপত্তি (expansion) এই সাধনার সহায়। আসনের সঙ্গে সঙ্গে কিছু বন্ধ ও মুদ্রার অভ্যাস থাকলে তাড়াতাড়ি ফল পাওয়া যায়। জালন্ধরবন্ধ আর যোনিমুদ্রা প্রশস্ত। গীতাতে যেমন বলা হয়েছে শির, গ্রীবা আর কায়কে সমান রাখা—এইটির দিকে সব সময় দৃষ্টি রাখা ভাল।

আসনসিদ্ধির ফলে সর্বদেহব্যাপী একটি স্থির স্বচ্ছ সুখময় অনুভবের আবির্ভাব হয়। মনে হয়, ইষ্ট যেন আমার হৃদয়ে নিত্য রমমাণ। অগ্নি-সোমের যুগলধারার অনুভবও স্পষ্ট হয়ে ওঠে তখন।

স্বভাবতই তখন শ্বাস মৃদু অথচ গভীর এবং ছন্দোময় হয়ে আসে। বোধ হয় প্রত্যেকটি শ্বাসের সঙ্গে যেন 'অনিল অমৃত'কে ভিতরে শোষণ করে নিচ্ছে, দেহের প্রত্যেকটি কোষ যেন অমৃতে পূর্ণ হয়ে উঠছে। তখন শ্বাসের দিকে একটু দৃষ্টি দিতে হয়। অর্থাৎ শ্বাস সম্পর্কে সচেতন হতে হয়—শ্বাস-প্রশ্বাসের একটি ছন্দও যেন আমার নজর না এড়িয়ে যায়। তার জন্য শ্বাস-প্রশ্বাসে জপ খুব সহায়ক। বাক্‌সংযম ছাড়া জপসিদ্ধি হয় না। একটি কথাও বৃথা বলবে না, যা নিতান্তই বলার তা-ও সংক্ষেপে বলবে—সূত্রের মত। এই বাক্‌সংযমের সঙ্গে প্রাণায়ামের সম্পর্ক আছে বলে এখানে তার উল্লেখ করছি। শ্বাস আর জপ যদি ছন্দোময় হয়ে যায়, বাউলের ভাষায় 'মন-পবনের নাও'-এ যদি একবার 'চড়ে বসতে পার' তাহলে প্রাণায়াম সহজ হয়। সে-প্রাণায়াম আর কিছুই নয়—শ্বাস নেবার পর আর ফেলবার পর একটু করে বিরাম। যম-নিয়মের সাধনায় যদি চিত্তের স্বচ্ছতা আসে এবং আসন অভ্যাসের ফলে দেহ যদি ইষ্টসম্প্রয়োগজনিত স্থির সুখে বিভোর হয়ে থাকে, তা হলে শ্বাস-প্রশ্বাসের এই গতিবিচ্ছেদ বা বিরাম খুব অনায়াস এবং গভীর হয়। তার ফলে অনুভব হয়, আমি যেন আরেকটা রাজ্যে আছি, যেখানে সব স্বচ্ছ, লঘু এবং জ্যোতির্ময়। এক অদৃশ্য আলোতে ভিতরটা যেন ভরে ওঠে—অনেকটা যেন জ্বলন্ত neon-gas-এ ভরা একটা

globe-এর মত। এই বোধটিই হল প্রাণায়ামের আসল ফল। প্রাণায়ামের নানা কসরতের কথা বললাম না—নিষ্প্রয়োজন এবং অনেক সময় অনিষ্টকর ব'লে। এই সহজ প্রাণায়ামের ফলেই কখনও কখনও শূন্যতার বোধ এসে কুম্ভক আপনা হতেই হয়ে যায়। তা ছাড়া দম বন্ধ হয়ে যাওয়াটাই তো আসল কথা নয়।

আসন আর প্রাণায়ামের ফলে দেহবোধ এমনি করে স্বচ্ছ হয়ে গেলে চিত্ত নিজের মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পায়, রসের সন্ধানে আর সে বাইরে যায় না। তখনই প্রত্যাহারের সাধনা সহজ হয়।

প্রত্যাহারের গোড়ার কথা হচ্ছে 'আপনাতে মন আপনি থাক'। বিষয়ের টানে চিত্ত বাইরে ছুটে যায়, নিজেকে তখন হারিয়ে ফেলি, বিষয়ের মাঝে ডুবে গিয়ে কাজের স্রোতে ভেসে চলি। এ ব্যাপারটা স্বাভাবিক। এরই মাঝে হুঁশে থাকা, বিষয় থেকে নিজেকে আলাদা রাখা, একটুখানি ভিতরের দিকে ঝোঁক—এইটিই প্রত্যাহারের অঙ্গ। খানিকটা বৈরাগ্য অভ্যাস না করলে প্রত্যাহারের যোগ্যতা জন্মায় না। কোনও কিছুতেই আঁট থাকবে না, চিত্তটি হবে বালকের চিত্তের মত ফাঁকা, অথচ সব সময় সচেতন—এইটি হল প্রত্যাহৃত চিত্তের লক্ষণ। ট্রেনে যেতে যেতে জানলা দিয়ে বাইরের দৃশ্য দেখছি। দেখতে ভালই লাগছে, কিন্তু আমার কোনও আসক্তি নেই তাদের প্রতি। প্রতি মুহূর্তেই তাদের ছেড়ে চলেছি, মনের গভীরে জানি আমি চলেছি বৃন্দাবনে, এসব দেখা পথের দেখা শুধু। জীবনের প্রতি মুহূর্তে জগতের প্রতি, নিজের কাজ-কর্মের প্রতি, এই-যে স্বচ্ছন্দ মুক্তির ভাব বহন করা, এই হল প্রত্যাহার। প্রত্যাহারের ফলে ইন্দ্রিয় সম্পূর্ণ আমাদের বশে আসে।

এই হল যোগের বহিরঙ্গের পরিচয়। এতে সিদ্ধিলাভ করলে বহির্জগৎ, অন্তর্জগৎ—আর সেই অন্তর্জগতের কেন্দ্রে যে আমার প্রাকৃত দেহ, প্রাণ, মন এগুলোর ওপর আমাদের বশীকার জন্মে। এরা থাকে, কিন্তু আমাকে আর আচ্ছন্ন কিংবা চঞ্চল করে না। তবে মনে রাখতে হবে, শুধু অনাচ্ছন্ন বা অচঞ্চল থাকাটাই যোগীর লক্ষণ নয়। এর সঙ্গে একটা আত্মসচেতনতা থাকা চাই। অর্থাৎ সাংখ্যের ছক অনুযায়ী ভূতশুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সংযম ও মনঃস্থৈর্যেরও পরে চাই অহংতত্ত্বের বিশুদ্ধি। সাধুসন্ন্যাসীরা মহাবাক্যের সাধনায় এটি করেন—যেমন অনবরত জপ করছেন 'শিবোঽহম্', 'অয়মাত্মা ব্রহ্ম' কিংবা 'তত্ত্বমসি' ইত্যাদি। ভক্ত হয়তো জপ করছেন 'আমি তোমার, আমি তোমার'। এই সাধনাটি ক্রিয়াযোগের স্বাধ্যায় আর ঈশ্বরপ্রণিধানের অন্তর্গত। নিজের স্বচ্ছতা এবং পবিত্রতাকে সব সময় অনুভব করলে আর সেই সঙ্গে আমি যে বৃহতের সঙ্গে যুক্ত এই ভাবটি বহন করলে অহঙ্কারের ময়লা কেটে গিয়ে তা স্বচ্ছ হয়ে ওঠে। মেয়েরা কারও ভালবাসা পেয়ে হঠাৎ যেমন একটা মধুর আত্ম-সচেতনতায় নিজের মধ্যে জেগে ওঠে, বাহির-ভিতর সব যেন একটা নতুন সুরে বাঁধা হয়ে যায়, নিজের দেহ-প্রাণ-মন যেন স্বচ্ছ, নির্মল ও সুরভি হয়ে ওঠে—এই ভাবটিকে যোগের বহিরঙ্গ-সিদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা চলে। যোগের কসরতের দিক্‌টাকে বড় করে দেখবার কোনও দরকার হয় না। আমাদের প্রকৃতির মধ্যে অতি সহজেই নানারকম স্বাভাবিক যোগের ক্রিয়া ঘটছে, সেইগুলোর দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই বিশেষ করে। সহজ হওয়ার মত বড় যোগ আর নাই।

২

অষ্টাঙ্গ যোগ ঃ অন্তরঙ্গ

ভূমিকা সারা হল। এইবার অন্তরঙ্গ যোগের কথায় আসি। যোগের অঙ্গগুলো আমরা ছকমত সাজিয়ে নিচ্ছি, বোঝবার সুবিধার জন্য। নইলে সব অঙ্গগুলিই বলতে গেলে ওতপ্রোত। অনেক সময় আমাদের কল্পিত ক্রমকে উল্‌টে দিয়েও তাদের ক্রিয়া হতে পারে। যোগের আসল লক্ষ্য দ্রষ্টার স্বরূপে অবস্থান—এই কথাটি মনে রাখলে অঙ্গগুলোর পরস্পরের মধ্যে পরস্পরের সম্পর্কটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

অন্তরঙ্গ যোগের প্রথম অঙ্গ হল ধারণা। সূত্রকার বলছেন, 'দেশবন্ধশ্চিত্তস্য ধারণা' অর্থাৎ চিত্তকে যদি একটা দেশে বাঁধতে পারা যায়, তাহলেই তা হল ধারণা। প্রথমেই বলি, ধারণার গোড়ার কথাটা হচ্ছে একটা স্বচ্ছ শুদ্ধসত্ত্বময় দেহাত্মবোধ সৃষ্টি করা। এই ধারণাই হঠযোগীর কায়াসাধনের মূল। কায়াসাধন ছাড়া যোগ হয় না। আসন, প্রাণায়াম, আর প্রত্যাহারের ভিতর দিয়েও তুমি কায়াসাধন করে এসেছ। আসনে দেহবোধ স্থির হয়েছে—শ্রীরামকৃষ্ণের ভাষায় 'তুমি যেন অচল অটল সুমেরুবৎ' এই বোধটি তোমার সব সময়ের সঙ্গী হয়েছে। তাইতে তোমার চলা-ফেরা শোয়া-বসা সব কিছুর মাঝেই অঙ্গ-স্থৈর্যের ভাবটি এসেছে। প্রাণায়ামে দেহবোধে স্বচ্ছতা এসেছে আর এসেছে লঘুতা।

প্রত্যাহারে দেহবোধ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এই স্থৈর্য লঘুতা আর ঔজ্জ্বল্যের বোধকে এখন একটা জায়গায় জমাট করতে হবে। তাই হল ধারণা। করবে কোথায়? প্রথমে কর তোমার এই চৌদ্দ-পোয়া দেহের মাঝে। তোমার দেহকে কেন্দ্র করেই তোমার জগৎ। এখন কেন্দ্র-সচেতন হও, বহিরঙ্গ যোগে যে উজ্জ্বল দেহবোধ এসেছে, তারও কেন্দ্রকে অধিকার কর—দেহের মধ্যে ডুব দিয়ে। এই হল এক রকমের ধারণা। এর কথাই আগে বলছি।

আসন-সাধনার সঙ্গে ধারণার একটা গভীর যোগ আছে। আসনসিদ্ধির তিনটি লক্ষণ—স্থিরসুখ, প্রযত্নশৈথিল্য আর অনন্ত-সমাপত্তির বোধ। তিনটি বোধই দেহকে আশ্রয় ক'রে। বসে যখন কাজ করছ, তখন মাঝে মাঝে পরখ করে দেখতে হয়, দৈহ্য চেতনা (physical consciousness) ঐ তিনটি বোধে জড়িত আছে কিনা। তিনটি বোধে বস্তুত তিনটি ভূতের শুদ্ধি হয়—উপনিষদের ভাষায়, 'তাদের প্রাকৃত ভূতগুণ দূর হয়ে অপ্রাকৃত যোগগুণ তাদের মধ্যে প্রবৃত্ত হয়'। পৃথিবীর গুণ কাঠিন্য, তারই যোগগুণ হল স্থির-সুখের বোধ। অপের গুণ তারল্য, তারই যোগগুণ হল প্রযত্ন-শৈথিল্য—ঐ স্থির সুখময় বোধের উপরই যেন লাবণ্যের ঢেউ খেলে যাওয়া। দেহটাকে তখন মনে হবে যেন কচি ছেলের দেহের মত আনন্দে টলমল। বায়ুর গুণ হল সর্বগামিত্ব, যোগের ভাষায় বলে প্রণামিত্ব। তারই যোগগুণ হল অনন্তসমাপত্তি। তাতে মনে হবে—দেহের ভিতরটা যেন নিরেট নয়, বাইরে-ভিতরে কোনও ব্যবধান যেন নাই, সমস্ত দেহ যেন বাষ্পের মত হয়ে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। এই তিনটি বোধের সঙ্গে প্রাণায়ামের বোধ (যাকে উপনিষদ বলেছেন

'বায়ুরনিলম্' বায়ু যেন জীবন্ত অমৃতের স্রোত—এই প্রতি নিঃশ্বাসে ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী অমৃতকে পিণ্ডে শোষণ করে নেওয়া আবার তাকে ব্রহ্মাণ্ডময় ছড়িয়ে দেওয়া) যখন যুক্ত হয়, তখন অগ্নির গুণ যে উষ্ণতা, তারই যোগগুণ ভিতরে আবির্ভূত হয়। তাতে দেহ-প্রাণ-মনের একটা অপূর্ব স্বচ্ছতা ও তাপ-পরিকিরণের বোধ নিয়ে আসে। লোকে যাকে 'প্রতিভা' বলে তা এই প্রাণায়ামের গুণ। শ্বাসকে নিয়ন্ত্রিত কর, বুদ্ধি খুলবে।

তা হলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে এই : আসন-প্রাণায়ামের ফলে একটা পরিব্যাপ্ত, শান্ত, স্বচ্ছ দেহবোধের অধিকারী হবে তুমি। আকাশের মাঝে সূর্য যেমন জ্বলছে, বৈদিক ঋষির ভাষায় 'পৃথিবী অন্তরিক্ষ দ্যুলোককে আপূরিত করে', তেমনি তোমারও চিন্ময় বিগ্রহ তোমার বিশ্বকে সঞ্জীবিত আলোকিত করে জ্বলছে। বাইরের প্রকৃতি আর তোমার অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে সত্তার বোধে এবং ক্রিয়ায় একটা পরিপূর্ণ সৌষম্যের অনুভব তোমার মধ্যে জাগবে তখন।

এখন তোমার দেহকে কেন্দ্র করে এই যে চিন্ময় শক্তি ও বোধের জগৎ, একে প্রত্যাহারের শক্তিতে ভিতরে গুটিয়ে আনতে হবে—এই হল অন্তর্ধারণার গোড়ার কথা।

যেমন পৃথিবীর একটা অক্ষদণ্ড (axis) আছে, তেমনি যোগ-তনুরও একটা অক্ষ আছে। মেরুদণ্ড হল সেই অক্ষ। পৃথিবীর অক্ষ যেমন সব সময় ধ্রুবের দিকে লক্ষ্য করে আছে, তেমনি তোমার এই দেহের অক্ষও মস্তিষ্ক কোটরের মধ্যকার মহাশূন্যে প্রজ্বলন্ত এক সূর্যকে লক্ষ্য করে আছে। এই ভিতরের সূর্য আর বাইরের সূর্য একই তত্ত্বের অধ্যাত্ম ও অধিদৈবত রূপ। ঠিক দুপুরবেলায় সূর্য যখন

মাথার উপর আসে (বিশেষ করে উত্তরায়ণে) তখন বাইরের সূর্য আর ভিতরের সূর্য একসূত্রে গাঁথা পড়ে। এই মাধ্যন্দিন ক্ষণটির মাহাত্ম্যের কথা বেদে আছে। এই সময় প্রকৃতি থেকেই সৌর শক্তিকে আকর্ষণ করবার আনুকূল্য পাওয়া যায়। বাইরের সূর্যেরও ঊর্ধ্বে এক ধ্রুব সূর্য আছে ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে, তাকে ঈশ্বর হিরণ্যগর্ভ ইত্যাদি বলতে পার। সেই সূর্যের একটি কিরণ তোমার ব্রহ্মরন্ধ্রকে ভেদ করে মেরুদণ্ড বেয়ে মূলাধারে গিয়ে সঞ্চিত হয়েছে। এটিকে যজুর্বেদে 'সুষুম্ণ সূর্যরশ্মি' বলা হয়েছে। এই রশ্মিটি অন্তর্ধারণার আশ্রয়।

ধারণা করতে হবে ভাবনার দ্বারা। এর সঙ্গে প্রাণায়ামের যোগ আছে। তাই প্রাণায়ামের একটি ফল: 'ধারণাসু চ যোগ্যতা মনসঃ' (২।৫৩)। প্রাণায়ামকে কঠিন কসরৎ করে তোলবার দরকার হয় না। বৈদিক প্রাণায়াম অতি স্বাভাবিক ও স্বচ্ছন্দ-কৌশল। বুদ্ধদেবও তার বিবৃতি দিয়ে গেছেন, তাকে বলেছেন 'আনাপান-দীপনী'। তন্ত্রের অজপা-জপের সঙ্গে এই প্রাণায়ামের খুব নিকট সম্পর্ক। তন্ত্রের সাধনাটা একটু খুলে বললে ব্যাপারটি বোঝা সহজ হবে।

তন্ত্রের জপযোগে প্রাণায়াম, প্রত্যাহার আর ধারণা তিনটিকে একসঙ্গে গেঁথে নিয়ে অতি সুন্দর সহজ ও সার্বভৌম একটি সাধনপন্থা আবিষ্কার করা হয়েছে। খুব সংক্ষেপে তাঁর একটা বিবৃতি দিচ্ছি।

৩

জপযোগ ঃ চতুরঙ্গ

তন্ত্র বলেন, শিব-শক্তি-মন-মারুত চারিটিকে এক করে জপ করতে হবে। শিব মাথার উপরে—যে মহাশূন্যের কথা আগে বলেছি, সেইখানে। শক্তি মূলাধারে। শক্তির যাতায়াতের পথ হল সুষুম্ণ-রশ্মি। তোমার মন্ত্র হল মন। মন্ত্র হল একটি ভাব, একটি বীজ—যা তোমার সত্তার সার বা সত্ব (Essence)। মন্ত্রজপ করা বা মন্ত্রস্মরণ করা হল মনকে একাগ্র করার একটি উপায়। এটি প্রত্যাহারের সাধনা। মন্ত্র-চৈতন্যের ফলে অন্তশ্চেতনায় যখন মন এত নিবিষ্ট হয়ে যায় যে বাইরে যা-কিছু দেখছ বা শুনছ তা-ও তোমার ভিতরের মন্ত্রটি জাগিয়ে দেয়, তখন মন্ত্রযোগের প্রত্যাহার সিদ্ধ হল বলতে হবে। আর মারুত হল তোমার শ্বাস-প্রশ্বাস। তোমার প্রাণক্রিয়ার মধ্যে এইটিই সুস্পষ্ট সহজবোধ্য অবিচ্ছেদ্য এবং ছন্দোময়। এইজন্য এইটিকে ধরে প্রাণ বশ করা এবং তার ফলে মনকে স্বচ্ছ করা সহজ। আর একটি স্পষ্ট প্রাণক্রিয়া হচ্ছে হৃৎস্পন্দন, এ-ও অবিচ্ছেদ এবং ছন্দোময়, এ-ক্রিয়াটি হচ্ছে তোমার ভিতরে। শ্বাসের ক্রিয়া কিন্তু প্রতি মুহূর্তে বাইরে-ভিতরে যোগসাধন করছে তোমার, তাই তার সহায়ে বিশ্বচেতনাকে সহজে উদ্বুদ্ধ করা যায়। এইজন্য সাধনার পক্ষে হৃৎস্পন্দনের ছন্দের চাইতে শ্বাসের ছন্দ বেশী উপযোগী।

আরেকটা কথা বলে নিই। বোধহয় বুঝতে পারছ, ধারণার সঙ্গে দেহবোধের সম্পর্ক এত নিবিড় কেন। দেহ-প্রাণ-মন এই তিনটি নিয়ে তোমার প্রাকৃত সত্তা। তিনটিকে দেখতে হবে একই চৈতন্য-গুণের প্রকাশের বিভিন্ন মাধ্যম হিসাবে। অনুভব যেখানে স্তিমিত এবং জড় তা-ই দেহ, যেখানে চঞ্চল তা-ই প্রাণ, যেখানে স্বচ্ছ তা-ই মন। সাধনা করতে হবে মন দিয়ে। কিন্তু শুদ্ধ মনটিকে তো আমরা পাই না, তার মধ্যে সব সময় জড়ত্ব আর চাঞ্চল্যের ভেজাল থাকে। অথচ জড়ত্বের একটা যোগগুণ আছে—স্থৈর্য। তেমনি চাঞ্চল্যের যোগগুণ হল সংবেগ। মন যদি স্থির এবং সংবেগী হয়, তাহলেই তুমি পেলে শুদ্ধ মন বা যোগীর মন। তোমার প্রাকৃত সত্তার মাঝে দেহটাই স্থির আছে, তার ধর্মগুলি অনেকটা যন্ত্রের মত নিশ্চিতভাবে কাজ করে। প্রাণের ক্রিয়া তার চাইতে চঞ্চল, আর মনকে তুমি ধরতেই পার না। এখন দেহের এই স্থিতিধর্মের সঙ্গে মনকে যদি জড়িয়ে নিতে পার, তাহলে ওটা পোষ মানবে। এই হল এক-দিককার কথা। আবার মনের স্বচ্ছতা যদি দেহবোধে সঞ্চারিত হয়ে ওকে স্বচ্ছ ও লঘু করে তোলে, তাহলে দেহ আর মনের সাযুজ্যে অধ্যাত্মবোধ পাকা হতে পারে। প্রাণায়াম (আনাপানদীপনী অর্থে) এই স্বচ্ছতা আনবার পক্ষে মস্ত সহায়। এমনি করে দেহ-প্রাণ-মনের সম্মিলিত ব্যাপারে ধারণা সহজ হয়।

এখন আবার ফিরে যাই অজপা-জপের কথায়। প্রথম শ্বাসের সঙ্গে মন্ত্রকে গেঁথে নিতে হবে। মন্ত্র ছাড়া একটি শ্বাসও নেবে না বা ছাড়বে না। মন্ত্র-বীজ হোক বা নাম হোক, তার সঙ্গে যোগ করে নিতে হবে একটি স্বাভাবিক মন্ত্র বা প্রণব। পতঞ্জলি বলেছেন,

প্রণব ঈশ্বরের বাচক (১/২৭)। প্রণব দিয়ে মন্ত্রটিকে পুটিত করে নিতে হয়। ধর, মন্ত্র হল 'হ্রীং' বা 'হরি' বা গায়ত্রী। পুটিত করলে দাঁড়াবে ওঁ হ্রীং ওঁ, ওঁ হরি ওঁ ইত্যাদি। এখন প্রথম প্রণবটির ভাবনা করতে হবে, আর জপ করতে হবে শেষের প্রণবটির। প্রথম প্রণবটির ভাবনা করবে শুদ্ধ স্মৃতি বা ধ্রুবা স্মৃতি দিয়ে। এইটি আগে একটু অভ্যাস করে নিতে হয়। মাণ্ডুক্যোপনিষদের প্রথম মন্ত্রটি দেখ। ওঙ্কারই সব। দার্শনিকের ভাষায়, আকাশে যে নিত্য শব্দ বা পরা বাণী, তাই ওঙ্কার। অনন্তসমাপত্তির ভাবনায় দেহবোধটা যদি খানিক লঘু এবং ব্যাপক হয়ে থাকে, তাহলে সর্বব্যাপী আকাশের বোধটা দেহের বাইরে-ভিতরে সব সময় জাগিয়ে রাখা কঠিন হয় না। এই আকাশ শক্তিতে স্পন্দিত। সেই স্পন্দনই ওঙ্কার। আকাশ যেন অনবরত ঝঙ্কৃত হয়ে বলে চলেছেন ওঁ....ওঁ....আমি....আমি....I AM THAT I AM। মহাশূন্যের এই আত্ম-ঘোষণাই ওঙ্কার, তা-ই শব্দব্রহ্ম বা নাদ, তা-ই তোমার সত্তার মূলে অনাহত ধ্বনি। আবার তা-ই তোমার অহঙ্কারও। ওঙ্কারে স্পন্দিত এই আকাশ-ভাবনা হবে তোমার চেতনার পটভূমিকা। 'আকাশ আমার নিত্যসঙ্গী'—এই ভাবটি সর্বদা বহন করে চলাই হল শুদ্ধ স্মৃতি বা ধ্রুবা স্মৃতি দিয়ে নিত্য ওঙ্কারের ভাবনা। ঈশ্বর-প্রণিধান বা feeling the living Presence of God হতে এই ভাবনা সহজ হয়।

তারপর মূলমন্ত্র আর শেষের ওঙ্কার—এই দু'টির সহায়ে স্ফুট বা অস্ফুট যেভাবেই হোক, বাগ্‌যন্ত্রকে চালনা করে জপ করে যেতে হবে। শ্বাস টানবার সময় মূলমন্ত্র (যেমন হ্রীং), ছাড়বার সময়

শুধু ওঁ; গায়ত্রীর বেলায় শ্বাস টানবার সময় 'ধীমহি' পর্যন্ত, ছাড়বার সময় 'প্রচোদয়াৎ ওম্' পর্যন্ত। এই হল জপের বিধান।

প্রথম শ্বাসের গতিকে লক্ষ্য করতে হবে। শ্বাস টানার সময় বায়ুর একটা ধারা হৃদয় পর্যন্ত নামছে, এইটি স্পষ্ট অনুভব করতে হবে। আবার ছাড়বার সময় হৃদয় হতে উঠে ভ্রূমধ্য ভেদ করে করোটির (skull-এর) ভিতর দিয়ে তা মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে—এইটিও অনুভব করতে হবে। এমনি করে শ্বাসের দুটি ধারার সঙ্গে বোধের দুটি ধারা ওঠানামা করবে এবং সেইসঙ্গে মন্ত্রজপ চলবে—টানবার সময় মূলমন্ত্র, ছাড়বার সময় ওঁ। এই ব্যাপারটিকে বাউলরা বলেন, 'মন-পবনের নৌকোয় বাচ খেলা'। বাচ খেলতে খেলতে 'মন-পবনের নাও' ক্রমশঃ উজিয়ে যায়, তারপর সব আবর্ত বা গ্রন্থি পেরিয়ে মহাশূন্যে লয় হয়ে যায়। এই বর্ণনা বেদেও আছে।

এই হল কৌশলটুকুর কথা, মন আর মারুতের কথা। এখন এর সঙ্গে যোগ করতে হবে শিব-শক্তিকে। শিবের স্থান মাথার উপরে, মহাশূন্যে। প্রথম যে-ওঙ্কারের কথা বলেছি, তিনিই শিব, তিনিই সবিতা। তিনি তোমার ঊর্ধ্বে আশে-পাশে সব জায়গায় ছড়িয়ে আছেন, যেন কদম্ব-গোলকের মত। আর তাঁর জ্যোতিঃ-শক্তির অনন্ত রশ্মি এসে কেন্দ্রীভূত হচ্ছে তোমার হৃদয়ে—ঐটি হল জীবস্থান। আপাতত শক্তিকে ধারণা করতে হবে ঐখানে। তোমার বিশ্বের কেন্দ্র তোমার হৃদয়। ঐ হৃদয়ের কেন্দ্রবিন্দু হতে অনন্ত রশ্মিরেখা তোমার উপরে-নীচে আশে-পাশে যেমন বিকীর্ণ হয়ে পড়েছে, তেমনি তোমায় ঘিরে যে চিৎ-সমুদ্র, তা হতে প্রতি মুহূর্তে ঐ রশ্মি-রেখা ধরেই বিশ্বেশ্বরের শক্তি তোমাতে অনুপ্রবিষ্ট হচ্ছে।

তোমার দেহটিকে কল্পনা কর মহাশূন্যে ভাসন্ত পৃথিবীর মত, তাকে ঘিরে জ্যোতিঃ-শক্তির সমুদ্র। পৃথিবীর অক্ষের মতই এই জ্যোতিঃ-সমুদ্র হতে শক্তিসঞ্চারের একটি প্রধান পথ আছে—তোমার ব্রহ্মরন্ধ্র হতে মূলাধার পর্যন্ত তা বিস্তৃত। তার ঠিক মাঝখানটায় হৃদয়-গ্রন্থি বা জীবস্থান। প্রধান পথটির নাম সুষুম্ণ-পথ, মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে চলে গেছে উপরপানে। তার ঠিক সমান্তরালে সামনের দিকে হল শ্বাসের পথ, নিশ্বাসে-প্রশ্বাসে আমরা বায়ুর সঞ্চরণ এইখানেই অনুভব করি।

মন্ত্রজপের সময় শ্বাস নিতে নিতে চিন্তা করতে হয় ডাইনে-বাঁয়ে উপরে-নীচে ব্যাপ্ত শিবমণ্ডল হতে তাঁর শক্তি অথবা তিনিই মূর্ধা ভেদ করে শ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে জীবস্থানে প্রবেশ করছেন এবং ঘুমন্ত জীব-চেতনাকে যেন জাগিয়ে দিচ্ছেন। প্রশ্বাসের সময় সেই জীব-চেতনা আবার তাঁরই সঙ্গে ভ্রূমধ্য ও মূর্ধা ভেদ করে মহাশূন্যে ছড়িয়ে পড়ছে। নিশ্বাস হল জীবন, প্রশ্বাস মরণ। নিশ্বাসে আধার শক্তি-যুক্ত হচ্ছে, আবার প্রশ্বাসে শিবময় হয়ে যাচ্ছে। শিবময়ী শক্তি আবার যখন নিশ্বাসের সঙ্গে হৃদয়ে ফিরে আসছে, আসছে ঐশ্বর্যময়ী হয়ে—দেহের অণু-পরমাণুকে তখন সে চিন্ময় করে তুলছে। এমনি করে ক্রমেই বাইরের ও ভিতরের, জড়ের ও চেতনার, শিবের ও শক্তির ভেদ দূর হয়ে যাবে। ক্রমে সমস্ত অনুভবই যেন শিব-শক্তিময় হয়ে উঠবে, শিবশক্তির ওতপ্রোত মিলনের ভাবনায় বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পূর্ণ হয়ে যাবে। এই অবস্থাটিকে বলে সামরস্য। এই সামরস্যের অনুভবই হচ্ছে ঐ আদি ওঙ্কার, যাকে বীজের মেরুরূপে ভাবনার কথা প্রথমেই বলেছিলাম।

একটা স্থূল উপমা নেওয়া যাক। ধর, স্ত্রী-পুরুষের ভালবাসা। তারা পরস্পরকে চাইছে। এই চাওয়ার প্রথমটায় থাকে দেহমনের আকুলি-বিকুলি, পরস্পরকে কাছে পাবার জন্য নানারকম কায়িক চেষ্টা। কিন্তু মিলন সম্পূর্ণ হলে আর কোনও বিক্ষিপ্ত বোধই থাকে না—একের মাঝে অপরের মিশে গিয়ে 'রজনীগন্ধা হৃদয়ের দুরুদুরু' ছাড়া। জপের তন্ময়তাতেও ঠিক এই ভাবটি আসে। তখন অনুভবটি চলে যায় ভাবের গভীরে, শ্বাস-প্রশ্বাসের ক্রিয়াটা আর লক্ষ্যের মাঝে থাকে না। সুতরাং শক্তির ওঠা-নামাও থাকে না, শুধু হৃদয় থেকে একটা অজস্র বিকিরণের ভাব ছাড়া। তুমিই তখন যুগপৎ শিবশক্তিরূপে বিশ্বের কেন্দ্র।

৪

ধারণাযোগ ঃ ত্রিদেশ-চতুশ্চক্র

এই সাধনাটিকে বললাম শ্বাস-প্রশ্বাসকে আশ্রয় করে। কিন্তু ভাবনা ও জপ যত গভীর হয়, আপনি তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের বোধটা সামনে থেকে পিছনে চলে যায়। তখন স্পষ্টই অনুভব হয়, শ্বাস-প্রশ্বাস বাইরের একটা স্থূল ক্রিয়া, তার গভীরে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে যে সূক্ষ্ম প্রাণ-স্রোতের ওঠা-নামা চলছে, ঐটাই আসল। তখন শ্বাস-প্রশ্বাসের ভাবনা ছেড়ে ঐ প্রাণ-স্রোতের ভাবনায় চিত্তকে নিবিষ্ট করতে হয়। ভাবনার ধারা আগের মতই থাকে, শুধু চিত্ত বহির্দেশ ছেড়ে অন্তর্দেশে বিধৃত হয়—সুষুম্ণবিবরে। এই হল আসল ধারণার ক্রিয়ার সুরু।

শ্বাস-প্রশ্বাসে আমরা বহিশ্চেতন—অন্তর্মুখ হয়ে আমাদের অন্তশ্চেতন হতে হবে সুষুম্ণতন্তুকে আশ্রয় করে। চেতনার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া এখন আমাদের রক্তের মধ্যে ঢেউ তোলে, স্থূল হৃৎস্পন্দনে তার পরিণামকে আমরা অনুভব করি। সুষুম্ণা-সচেতন হলে রক্ত-স্রোত শান্ত হয়ে যাবে (সুতরাং আজকাল এত blood-pressure-এর যে উপদ্রব তা থাকবে না), কিন্তু প্রত্যেকটি ভাব ও ক্রিয়া মেরুদণ্ডের নাড়ীস্রোতে (nervous current-এ) একটা সূক্ষ্ম ও গভীর অথচ আনন্দবীর্যময় স্পন্দন জাগাবে। এখন আমাদের সুষুম্ণা অসাড়—সাধারণ মানুষের এক কামসুখের চরম ক্ষণে ছাড়া

সুষুম্ণা বড় একটা জাগে না। ঐ সময় ক্ষণেকের জন্য জাগে বলেই মানুষের মধ্যে কামাকাঙ্ক্ষা এত প্রবল। কিন্তু সুষুম্ণা জাগলে সামরস্যের আনন্দে অন্তর সব সময় নিষিক্ত থাকে—সারদাদেবীর ভাষায় তখন মনে হয়—'হৃদয়ে যেন সব সময় একটি ভরা ঘট'।

এই ভাবটি যখন আসে, তখন চিত্ত খুব শান্ত হয়ে ভিতরে গুটিয়ে যায় অর্থাৎ প্রত্যাহারের একটি গভীর সহজ অবস্থা আসে। তখনই প্রত্যেক সাধকের সংস্কার-অনুযায়ী দেহের বিভিন্ন চক্রে ধারণা অভ্যাস করতে হয়।

প্রাচীন যোগে ধারণার অথবা চিত্তবন্ধনের তিনটি প্রশস্ত দেশ নির্ধারণ করা হয়েছে—হৃদয়, ভ্রূমধ্য ও মূর্ধা। গীতাতে মৃত্যুযোগের আলোচনা আছে, সেখানে এই তিনটি দেশে প্রাণকে বা মনকে বাঁধবার উপদেশ দেওয়া হয়েছে। এর সঙ্গে আর একটি দেশকে যোগ করা যেতে পারে—কণ্ঠ। কণ্ঠ বলতে বুঝতে হবে চোয়ালের পিছনের দিক্। সমস্ত ধারণার কাজই প্রথম সামনের দিকে সুরু করে শেষে পিছনের দিকে ঠেলে নিয়ে যেতে হয়। একে উপনিষদে বলে 'অন্তরাবৃত্তি'। অন্তরাবৃত্তি শুধু মনের নয়; শরীরক্রিয়ার সঙ্গে যুক্ত যে বোধ, তাকেও নিয়ে যেতে হবে মেরুদণ্ডের দিকে।

হঠযোগে চারটি দেশে চারটি চক্র কল্পিত হয়েছে। কেউ চক্র না বলে বলেন পদ্ম। চক্রের ভাবনা অরূপ, শক্তিকে জ্যামিতির রেখাচিত্র দিয়ে ভাবনা করা। আর পদ্মের ভাবনা রূপময়, ওতে সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়-তর্পণের আভাস আছে। প্রত্যেকটি চক্র প্রাকৃত মানুষের কোন-না-কোনও চিত্তবৃত্তির আধার। যেমন হৃদয় হল ভাবের (emotion-এর) আধার—যৌগিক নাম অনাহত। কণ্ঠ হল

সংকল্পশক্তির—যৌগিক নাম বিশুদ্ধ। ভ্রূমধ্য হল বুদ্ধি বা জ্ঞান-বৃত্তির—যৌগিক নাম আজ্ঞা। আর মূর্ধা হল এক কথায় বলা যেতে পারে বিজ্ঞানের—যৌগিক নাম সহস্রার।

এই সব জায়গায় বায়ুকে এবং মনকে ধারণা করতে হয়, যার যার সংস্কার এবং লক্ষ্য অনুযায়ী। আবার সবগুলিকে মিলিয়েও ধারণা করা চলে। যাদের মাথা বেশ পরিষ্কার এবং চারিত্রিক দৃঢ়তা আছে, তারা যদি ভ্রূমধ্যে বা আজ্ঞাচক্রে ধারণা অভ্যাস করে, তা হলে ফল ভাল হয়। ওটাকে বলা যেতে পারে সাক্ষিস্থান—ওখান থেকে একটা আলোর ছটা নীচের দিকে নেমে এসে হৃদয়কে আলোকিত করছে। আরেকটা ছটা উপর দিকে উঠে ছড়িয়ে পড়ছে মহাশূন্যে। চিত্তকে সব সময় ভ্রূমধ্যে ধরে রেখে একই সময়ে উপরে-নীচে দুটো ক্ষেত্রে একটা ব্যাপ্তির অনুভব আনা খুব কঠিন নয়। জ্ঞানযোগের দিক্ দিয়ে এ-অভ্যাসের উপকারিতা এই—এতে ব্রহ্ম, আত্মা ও জগৎ এই তিনটি তত্ত্বেরই সমন্বিত ভাবনা করা চলে। মূর্ধন্য চেতনার মহাকাশ ব্রহ্ম, ভ্রূমধ্যের বিন্দুচেতনা আত্মা আর হৃদ্য-সমুদ্রের চেতনা জগৎ। ভ্রূমধ্যে থেকে সমস্ত জগৎকে আমরা হৃদয়ে পাচ্ছি এবং সেই সঙ্গে জানছি যে এই হৃদ্য-সমুদ্র ঐ মূর্ধন্য মহাকাশেরই প্রতিবিম্ব মাত্র। মেয়েদের পক্ষে এই ভাবনা তাদের দেহ-মনের গঠনের খুব অনুকূল। যে-মেয়ের মধ্যে বিদেহ-ভালবাসার আনন্দ ফুটেছে, সে স্বচ্ছন্দে ঐ ভ্রূমধ্য থেকে একই সঙ্গে দুটো রসের আস্বাদন করতে পারে; হৃদয়ে বাৎসল্য এবং শিরসি সহস্রারে শিবসঙ্গের মাধুর্য। জগৎ তার বুকে শিশুর মত এবং মাথার উপর থেকে শিব তাঁর সৌম্য আনন্দ ঢালছেন তার সমস্ত সত্তায়, তার চেতনার একটা দিক মুহুর্মুহু ঐ মহাশূন্যে ঢলে পড়ছে।

চারটি চক্রকে অবলম্বন করে এই হল মুখ্য ধারণা। তার মধ্যে হৃদয়ে, ভ্রূমধ্যে আর মূর্ধায় ধারণাই হল আসল। এই তিনটিতে চিত্তবন্ধ অভ্যাস হয়ে গেলে বিশুদ্ধ চক্রের ধারণা আপনা থেকে ফুটে ওঠে। পতঞ্জলির এই ধারণার সঙ্গে হঠযোগীর বন্ধের একটা সম্পর্ক আছে, সে কথা পরে বলব। তা হলে বিশুদ্ধচক্রের ধারণার কথাটা স্পষ্ট হবে।

চক্রজ্ঞান বা দেশজ্ঞানের কথা হল। এখন জপের সহায়ে চিত্ত-বন্ধের কথায় আবার ফিরে যাই।

৫

মন্ত্রযোগ ঃ অজপারহস্য

তিনটি শক্তিস্রোতের উজান-ভাটা নিয়ে হচ্ছে যোগের সাধনা—বায়ুস্রোত (শ্বাস-প্রশ্বাস), নাড়ীস্রোত (nervous current), আর চিত্তস্রোত। এর মধ্যে বায়ুস্রোত আর নাড়ীস্রোতকে একসঙ্গে জড়িয়ে বলা হয় প্রাণস্রোত। শ্বাস-প্রশ্বাসের উজান-ভাটা যেমন স্বভাবের নিয়মে সারাক্ষণ চলছে, তেমনি নাড়ীস্রোত এবং চিত্ত-স্রোতের একটা উজান-ভাটাও সব সময় চলছে। চিত্ত বহির্মুখ থাকে বলে আমরা তা ধরতে পারি না ; বায়ুস্রোতকে প্রথমে লক্ষ্য করে অর্থাৎ বহিঃপ্রাণসঞ্চার সম্বন্ধে প্রথমে সচেতন হয়ে ভাবনার দ্বারা তাকে যদি পিছনে ঠেলে নেওয়া যায়, তাহলে নাড়ীস্রোতের উজান-ভাটা লক্ষ্য হয়। এটাকেই বলা যায় সুষুম্ণসতেচন হওয়া (to develop the spinal consciousness)। সুষুম্ণসচেতন হলে পরে ঐ নাড়ীস্রোতের মধ্যেই চিত্তস্রোতকে খুব সূক্ষ্মভাবে সঞ্চরণ করতে দেখা যায়। বলতে গেলে নাড়ীস্রোত আর চিত্তস্রোত একই কথা। আসলে তিনটি স্রোতই একই প্রকৃতির গুণভেদ মাত্র।

চিত্তস্রোতের লক্ষণটি এবার বুঝে নিতে পারলে জপবিজ্ঞান ভাল করে বুঝতে পারা যাবে।

বাইরে বিক্ষিপ্ত চিত্তের ক্রিয়া দেখতে পাচ্ছ—সেখানে সব কিছু ছন্নছাড়া, এলোমেলো। এই চিত্তের ক্রিয়াকে বলা চলে, অনেকটা

যেন বন্দুক ছুঁড়তে শিখতে গিয়ে লক্ষ্যবিন্দুকে বিদ্ধ করবার চেষ্টার মত। চিত্তের যে প্রবৃত্তি, তা বিষয়ের দিকে ছুটে যাচ্ছে, কিন্তু লক্ষ্যবিন্দুকে বিদ্ধ করতে পারছে না—তাকে ঘিরে লক্ষ্যফলকটাকে ঝাঁঝরা করছে মাত্র। কিন্তু লক্ষ্যবিন্দুটা কি? ওটি হল সচ্চিদানন্দ অর্থাৎ 'একটিমাত্র' সত্য বস্তুর চেতনা এবং আনন্দ। তাকেই যোগ-সূত্রে বলা হয়েছে 'একতত্ত্ব'। বাস্তবিক সেই 'একটি বস্তুকেই' বিষয়ের মধ্যে আমরা খুঁজে বেড়াচ্ছি কিন্তু পাচ্ছি না। চিত্ত ছটফট করছে তাইতে। অনুকূল কোনও বিষয়ে খানিকক্ষণের জন্য চিত্ত লগ্ন হলে পরে মনে হচ্ছে, এই বুঝি সেই বস্তুটি পাওয়া গেল। কিন্তু খানিক পরেই দেখা গেল, না, ওটি তো নয়। এমনি করে আঁতিপাঁতি করে খোঁজাটাই হল চিত্তের চাঞ্চল্যের কারণ। একটু যে তলিয়ে দেখতে শিখেছে, সে-ই বুঝেছে এতে কী গভীর অতৃপ্তি।

এই অতৃপ্তিতে বিরক্ত হয়ে চিত্ত যখন অন্তর্মুখ হয়, তখন সে আবিষ্কার করে—যাকে সে বাইরে খুঁজছিল সে তো ভিতরেই আছে। বাইরে যখন কানামাছি খেলার ছুটাছুটি চলছে, ঠিক তখনই ভিতরে ভিতরে আর একটি চিত্তসত্ত্ব কিন্তু প্রতিমুহূর্তেই তার ছোঁয়ায় জেগে উঠেই যেন এলিয়ে পড়ছে। এই ভিতরের চিত্তসত্ত্বকে বৈদিক ঋষিরা বলতেন 'মধ্বদ' বা 'পিপ্পলাদ'; বোঝাবার সুবিধার জন্য এর নাম দিতে পার গোপী। গোপী শ্যামের বাঁশী শুনতে পেয়ে চমকে উঠে দেখছে—ঐ যে শ্যাম। অমনি তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ছে। নিশ্বাসের ছন্দে এই ব্যাপারটি সত্যি-সত্যি ভিতরে ঘটছে প্রতিনিয়ত, কিন্তু আমরা বহির্মুখ বলে তাকে ধরতে পারছি না। বৈদিক ঋষিরা অগ্নি-সোমের যুগলধারা বলে এটাকে বর্ণনা করেছেন। সোমের

ধারা অবিরাম নেমে আসছে মহাশূন্য থেকে, হৃদয়ে এসে আগুনকে স্পর্শ করছে, অমনি আগুনের শিখা উঠে যাচ্ছে উপর-পানে। ছোট্ট একটা আগুনের ফুল্‌কি, তাই উপর-পানে উঠতে গিয়ে সূর্যের মত জ্বলে উঠছে, আরও উজানে জ্যোছনার মাধুরীতে ছড়িয়ে পড়ছে আকাশময়। দর্শনের ভাষায় ব্রহ্মচেতনা জীবে গুটিয়ে আসছে, জীবচেতনা ব্রহ্মে বিস্ফারিত হচ্ছে। শ্বাস-ক্রিয়ার তালে-তালে অনবরত এই ব্যাপারটি ঘটছে। এই ছন্দের দোলাই আমাদের জাগ্রৎ আর সুষুপ্তি, কর্ম আর বিশ্রাম, জীবন আর মরণ, বাইরের জগতে দিন আর রাত, মহাশূন্যে সৃষ্টির আর প্রলয়ের ফুল ফোটা আর ফুল ঝরা। আমাদের সমস্ত কাজে-কর্মে ভাবনায় চিন্তায় অনবরত এই tension আর relaxation চলছে—tension সৃষ্টি, relaxation প্রলয়। এইটাই আমাদের চিত্তস্রোত, ঠিক হৃৎস্পন্দনের মত। নিজের সত্তার মধ্যে এটি গোপনে রয়েছে ; ওকে যদি আবিষ্কার করতে পার, তাহলেই মুক্তি।

সাধনার সময় এ বস্তুটি যে আছে, এটি ধরে নিতে হয়—বৈজ্ঞানিক hypothesis-এর মত। ধরে নিয়ে কাজ করে যাও, কিছুদিন পরে দেখবে—সত্যি ওটা আছে। হয় তো বলবে, 'ওটা তো auto-suggestion দিয়ে তা হলে আমিই সৃষ্টি করলাম।' কিন্তু সত্যি বলতে সৃষ্টি তুমি করনি, আবিষ্কার করেছ। আর অধ্যাত্মজীবনে auto-suggestion-ই মূল শক্তি। তুমি যা ভাবছ, তাই হতে পারছ—এ যদি তোমার পক্ষে সম্ভব হয় তো সবই হয়ে গেল। আর যা আবিষ্কার করলে এমনি করে, তা যে সত্যি, তার প্রমাণ মেলে ঐটিকে ধরে সব কিছুর মীমাংসা হয়ে যায় যখন, তখন। তোমার

বৈজ্ঞানিকও বলবেন—একটা তত্ত্ব দিয়ে যদি প্রকৃতির সব তথ্য ব্যাখ্যা করা যায়, তা হলে সেটাই হল পরম সত্য। সে যদি auto-suggestion-এই পাও, তাতেই বা কি এসে যায়? অধ্যাত্মসাধনায় ভাবনাই হল প্রধান। প্রতি মুহূর্তে তোমার ভাবনা দিয়ে তুমিই তোমাকে গড়ে চলেছ। অন্তঃপ্রকৃতির এই নিয়মটাকে যদি বুঝতে পার, তা হলে সাধনার ভিত পাকা হল বলতে হবে। 'যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।' যা ভাববে তাই হবে। ভাবনাই অধ্যাত্মশক্তি।

অবান্তর কথা বললাম কিছু, কিন্তু বলা দরকার। আজকালকার মন যুক্তির বড়াই করতে গিয়ে সব হারিয়ে ফেলে কিনা।

চিত্তস্রোত বা শক্তিস্রোতের এই উজান-ভাটাকে তন্ত্রে একটি শ্লোকে সুন্দর বর্ণনা করা হয়েছে: 'হংকারেণ বহির্যাতি সঃকারেণ বিশেৎ পুনঃ। সোহং-হংসরূপেণৈব জীবো জপতি সর্বদা'—'হং' (তন্ত্রে শিববীজ, নাদবিন্দুযুক্ত—তার ব্যঞ্জনা লয়ের দিকে) বলে প্রাণ বেরিয়ে যাচ্ছে, আর 'সঃ' (তন্ত্রে শক্তিবীজ, বিসর্গযুক্ত, ব্যঞ্জনা সৃষ্টির দিকে) বলে অপানের আকর্ষণে সে ভিতরে ঢুকছে। এমনি করে 'হং সঃ' (যা উল্টিয়ে 'সোহং') মন্ত্র জীব অনবরত জপ করে চলেছে। হংস বেদে মহাসূর্য বা আদিত্য; 'সোহং' জীবের আত্ম-ঘোষণা। প্রতি মুহূর্তে, প্রতি কর্মে, প্রতি চিন্তায় তুমি এই হংসের সঙ্গে যুক্ত হয়ে আত্মঘোষণা করে চলেছ—যা নাকি বিকৃত হয়ে নানা আকারে তোমার অহংকারের রূপ ধরেছে। কাম্য লক্ষ্যবিন্দু বিদ্ধ না করে তার আশেপাশে এই আত্মঘোষণা ছিটকে পড়ছে আর বলছে: আমি অমুক, আমি তমুক। কিন্তু ভিতরের আসল জীবটি

বা মধ্বদ পুরুষটি জপ করে চলেছেন—'ওগো, আমি তুমি····তুমি আমি····', অথবা গোপীচেতনা বলছে: 'আমি তোমার····আমি তোমার।'

এই যে হংসমন্ত্রের ভাবনা, যা আমাদের চিত্তস্রোতের উজান-ভাটার স্বরূপ, স্ত্রী-পুরুষভেদে তার অভ্যাসের একটু তারতম্য হয়। মেয়েরা এটি সহজে ভাবনা করতে পারে, কেননা তারা স্বরূপ-প্রকৃতি। তাদের দেহ-প্রাণ-মন ইত্যাদি সব তত্ত্বই স্বরূপে অর্থাৎ তাদের স্বাভাবিক বৃত্তির অনুযায়ী কাজ করছে। একটি মেয়ে দেহে-প্রাণে-মনে সত্যি চিন্ময়ী; অর্থাৎ তার চৈতন্যের যে বিশিষ্ট বৃত্তি, তার সঙ্গে দেহ-প্রাণ-মনের সুর বাঁধা আছে। তাই মেয়ের হৃদয়ে মেয়েরূপেই তার আত্মস্বরূপের অবস্থান। সুতরাং শ্বাস টানবার সময় সে ভাবনা করবে মহাকাশ (হং বা শিব) যেন তাকে আবিষ্ট আপ্লুত করে নেমে আসছেন তার হৃদয়ে এবং তাঁরই চিন্ময় স্পর্শে হৃদয়ে তার আত্মশক্তি জেগে উঠছে 'সঃ' বলে—সে তখন সত্যি চিন্ময়-চতুর্বিংশতি-তত্ত্বরূপিণী মহাপ্রকৃতি। এমনি করে নিশ্বাসের সঙ্গে আত্মস্বরূপের উপলব্ধি করে প্রশ্বাসের সঙ্গে 'হং' বলে সে মিলিয়ে যাবে ঐ মহাশূন্যে শিবের বুকে। এই ধারায় পূর্ণ সত্তার ছন্দোময় ভাবনা চলবে তালে-তালে।

পুরুষের বেলায় এই ভাবনাই চলবে, কিন্তু পৌরুষেয়-বোধের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে। আসলে পুরুষ চৈতন্যমাত্র, সে বিদেহ। তার এই দেহ, শুধু দেহ কেন, তার প্রাণ-মন-বুদ্ধি সবই তো প্রকৃতি, সুতরাং সবই নারী। স্বরূপতঃ সে ছড়িয়ে আছে মহাশূন্যে; এবং 'সঃ' মন্ত্রে শ্বাস যখন ভিতরে ঢুকছে, তখন যাকে সৃষ্টি করছে সে পুরুষ

নয়, সে তারই শক্তিস্বরূপিণী নারী। নারী পুরুষের বাইরে নয়, ভিতরে; তাই তন্ত্রে পুরুষের নাম 'অন্তঃশাক্ত'। অতএব 'সঃ' মন্ত্রে সে নিজেকে নিজেই আলিঙ্গন করছে আত্মারাম হয়ে এবং তারই অন্তঃশক্তিকে ঊর্ধ্বক্রমে আবার চিন্ময়ীরূপে ফিরিয়ে নিচ্ছে নিজের মহাকাশের রিক্ততার মাঝে। এ-ব্যাপারটা আগাগোড়া একটা অদ্বৈত-বিলাস—এক ভেঙ্গে এখানে দুই হচ্ছে। আর নারীর বেলায় কিন্তু দুয়ে মিলে এক হচ্ছিল। প্রাকৃত পুরুষের পক্ষে এই সূক্ষ্ম ভেদটুকু ধারণা করা একটু শক্ত, কেননা, গোড়াতেই সে নিজের দেহ-প্রাণ-মনকে 'পুরুষ' বলে ধরে নিয়েছে কিনা। তার এই ভুলের ফল হয়েছে মারাত্মক, এতে সে নিজে ডুবেছে যে শুধু তাই নয়, নারীকেও ডুবিয়েছে।

যা বললাম তাতেই বুঝতে পারছ, অজপার ভাবনা মেয়ের পক্ষে একেবারে স্বভাবের ছন্দে গাঁথা, কিন্তু পুরুষের পক্ষে তা নয়—ব্রহ্মচর্য দ্বারা বিদেহ-ভাবনায় সিদ্ধ হয়ে তবে সে স্বচ্ছন্দভাবে এই ভাবনার অনির্বচনীয় রসকে আস্বাদন করতে পারে। অনেক পুরুষ ভক্তিতে নিজেকে মেয়ে করে ফেলে অজপা-সাধনকে সহজ করে নেয়। একেবারে বিবিক্ত না হতে পারলে খাঁটি পুরুষ হওয়া যায় না। সে কি সবাই পারে? তাই পুরুষের পক্ষে সহজ পথ হচ্ছে—হয় ছোট ছেলে হওয়া, নয় তো মেয়ে হওয়া। ছোট ছেলের স্বভাব আর মেয়েদের স্বভাব খুব কাছাকাছি—দুই-ই পরা প্রকৃতির স্ব-রূপ, লিঙ্গভেদ সেখানে খুব প্রবল নয়। বাইরের নাড়ীচ্ছেদ হলেও ছোট্ট ছেলের সঙ্গে মায়ের অন্তরের নাড়ীচ্ছেদ হয় না, তাই সে অনেকটা প্রকৃতিভাবাপন্নই থাকে। আর অধ্যাত্ম-সাধনায় নারী-পুরুষের ভেদটা

তো দেহে নয়, ভাবনায়। সুতরাং সাধনায় যেখানে নির্ভর বা আত্ম-সমর্পণের ভাব আছে, সেখানে সাধক স্বরূপত পরা-প্রকৃতি। যেখানে আত্মপ্রতিষ্ঠার ভাব, সেখানেই সে পুরুষ। কিন্তু এ-ভাব যে কঠিন এবং দুর্লভ, তা আগেই বলেছি। ছোট্ট ছেলে মা ছাড়া কিছু জানে না—মা তার কাছে মা-ও, বাবা-ও। সন্তানভাবে যখন মায়ের উপাসনা করছি, তখন মা পরম-পুরুষেরই মাধুর্য-মূর্তি। তাঁকে যদি পাই, নিজের পৌরুষকেও হয় তো খুঁজে পাব। না পেলেই বা কি? সব সাধনার শেষ কথা হল আত্মসম্পূর্তি, নিজের ঘট ভরানো। এখন সে যেভাবেই হোক না কেন।

এই হংসমন্ত্রের আর একটা রূপ আছে: ওঁ হ্রীং—টানবার সময় 'হ্রীং' বা শক্তি, ছাড়বার সময় 'ওঁ' বা শিব। একটু তলিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, এখানেও ভাবনার ধারা একই রকম—সেই সৃষ্টি আর প্রলয়ের ছন্দ। শক্তি সৃষ্টিরূপিণী, শিব প্রলয়-স্বরূপ। তন্ত্রে এইটাকেই আবার বলা হয় বিসর্গ এবং বিন্দু। বিসর্গে সৃষ্টি—তাই ঃ; অর্থাৎ এক দুই হ'ল। আবার বিন্দুতে লয়—তার চিহ্ন ০, অর্থাৎ একটি ফোঁটা। বাংলা লিপিতে ওকে নাদযুক্ত করা হয় বলে চেহারাটা হয় 'ং'; বিন্দু থেকে তির্যক্‌ভাবে শক্তি ঝরে পড়ছে। তির্যক্‌ভাবে কেন, না সোজাসুজি যদি শক্তি নেমে আসে তাহলে তো বিকারের সৃষ্টি হয় না, একটু তের্‌চা হলেই অব্যক্ত ব্যক্ত হতে পারে। সাংখ্যের ভাষায় এটাকে বলে বিসদৃশ পরিণাম।

হ্রীং সম্পর্কে একটু বলি। ওর নাম মায়াবীজ বা লজ্জাবীজ। ওঙ্কারের নাম ব্রহ্মবীজ। সংস্কৃতে 'হ্রী' শব্দের অর্থও লজ্জা। নারী লজ্জারূপিণী। এটা একটা খুব বড় তত্ত্ব। আমাদের দেশে নারী-

প্রকৃতিকে এই ভিত্তিতে বিকশিত করবার চেষ্টা হয়েছে। লজ্জার মনস্তত্ত্ব হচ্ছে অনুরাগবিবশতায় রূপকে আধখানি ঢাকা। সতী শিবকে ভালবেসে যেখানে শিবময়ী, সেখানে লজ্জা নাই, আছে আনন্দ। কিন্তু এই ভালবাসা রূপে ফুটতে গেল যখন, তখনই মহা-প্রকৃতি যেন কেমন হয়ে গেলেন—আধখানি তাঁর প্রকাশ হল তো আধখানি হল না। তাইতে সৃষ্টি অনির্বচনীয় হয়ে রইল। এইজন্য সৃষ্টি মায়া বা অনির্বচনীয়, তান্ত্রিক বলেন—ষোড়শী প্রকৃতির লজ্জার মাধুরী। বস্তুত সে লজ্জা অনির্বাচ্য আনন্দ—যতটুকু ব্যক্ত হয়েছে তাকে ঘিরে রয়েছে অব্যক্তের ব্যঞ্জনা। ওটুকু না হলে রস ফুটত না। ও হল ভালবাসার তির্যক্ মাধুরী। এই হল লজ্জাবীজের মূল ভাব; কিন্তু বীজটি বিশ্লেষণ করলে পাওয়া যাবে 'হ্' বা শিব (আকাশ বা সত্তাস্বরূপ), 'র্' বা অগ্নিবীজ (চিদগ্নি) এবং 'ঈ' বা রমাবীজ (শ্রী, আনন্দ, প্রেম), তারপর 'ং' বা নাদবিন্দু। তাহলে হ্রীং আবার সেই সচ্চিদানন্দেরই সঙ্কেত হয়ে দাঁড়াল। ওঁ হতে তার বৈশিষ্ট্য এই যে, 'হ্রীং' শক্তির আত্মবিসৃষ্টির মন্ত্র। জপের সময় হ্রীং মন্ত্রে নিজেকে শক্তিরূপে ভেবে ওঁ মন্ত্রে শিবস্বরূপে ছড়িয়ে দিতে হবে।

গায়ত্রীমন্ত্রে অজপাজপের সঙ্কেতটা বলে নিই, তাহলেই মোটামুটি সব বলা হয়ে যাবে। গায়ত্রীকে প্রণবপুটিত করে জপ করতে হবে—ওঙ্কার থাকবে পটভূমিকারূপে। অনেকে গায়ত্রীকে ব্যাহৃতিযুক্ত করে নিতে বলেন, কিন্তু প্রথমে সেটা দরকার হয় না। মূল গায়ত্রীর ভাবনা আয়ত্ত হয়ে গেলে ব্যাহৃতির ভাবনা বিলোমক্রমে আপনা হতেই ফোটে এবং শেষে সব ভাবনা ওঙ্কারে লয় হয়ে যায়। মন্ত্রটিকে

দুভাগ করে নাও—'তৎ সবিতুঃ' থেকে 'ধীমহি' পর্যন্ত এক ভাগ; 'ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ' আরেক ভাগ। প্রথম ভাগটি নিশ্বাসে, দ্বিতীয় ভাগটি প্রশ্বাসে জপতে হবে। ভাবনার সময় দুটি ক্রিয়াপদের উপর জোর দিতে হবে। 'ধীমহি' মানে আমরা (শুধু আমি নই—সাধক এখানে বিশ্বজনের প্রতিভূ, তার সাধনা একার জন্য নয়) নিহিত করছি। কী? না, সবিতার বরেণ্য ভর্গ। কোথায়? না, হৃদয়ে। সেই বরেণ্য ভর্গ মহাশূন্যস্থিত সবিতৃমণ্ডল হতে ব্রহ্মরন্ধ্র বেয়ে নেমে এল আমার হৃদয়ে, ধরল 'ধী' কিনা বুদ্ধি বা মহৎতত্ত্বের রূপ, যাকে বলে সমষ্টি জীবচেতনা। আমার কাজ শেষ হয়ে গেল। এখন প্রশ্বাসের ক্রিয়াপদ হল 'প্রচোদয়াৎ'—তিনিই এখন এই 'ধী'-কে সামনের দিকে (অর্থাৎ উপরের দিকে) ঠেলে নিয়ে চলুন—আমাদের 'ধী' তাঁর জ্যোতিতে মিলিয়ে যাক। দেখতেই পাচ্ছ, গায়ত্রীমন্ত্রও ঠিক অজপার ছন্দে রচিত।

এই অজপাজপের রীতি মন্ত্রযোগের মূল রহস্য। সব মন্ত্রের বেলায় একই ধরণে তার প্রয়োগ হয়ে থাকে।

সমস্ত ব্যাপারটার সঙ্গে গীতোক্ত মৃত্যুযোগের সম্পর্ক আছে। গীতার অষ্টম অধ্যায়ে তার সঙ্কেত পাবে। জীবনভোর এই অজপার ভিতর দিয়ে মৃত্যুর সাধনা করে যেতে হবে, তবে জীবন অমৃতময় হবে। মৃত্যুই চরম, শূন্যই শেষ তত্ত্ব। এ কথা অস্বীকার করে দিব্যজীবন লাভ হয় না, হতে পারে না।

এখন আবার ধারণার কথায় ফিরে আসি।

৬

ধারণা-যোগ ঃ দৈহ-বৈদেহ

মন্ত্রযোগের সহায়ে ধারণা অভ্যাসের বিবৃতি থেকে এটুকু বুঝতে পারছ, বৃহতের চেতনশক্তি ও আনন্দকে আধারে ধারণা করাই হল ধারণার সত্যকার তাৎপর্য এবং তার জন্য সুষুম্ণ-পথটাকে ভাবনার দ্বারা খুলে নেওয়া দরকার। সুষুম্ণ-যোগ যত সুপ্রতিষ্ঠিত হবে, ধারণাও তত সহজ হবে। অবশ্য এ কৌশলটি হঠযোগীদের। পতঞ্জলি এর কথা স্পষ্ট করে বলেন নি। তার কারণ আছে। পতঞ্জলি বিশুদ্ধ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে ব্যাপারটাকে বিশ্লেষণ করেছেন বলে কোনও অবান্তর কল্পনাকে স্থান দিতে রাজী নন। তাঁর মতে সাধনা হবে আত্ম-কেন্দ্রিক। অতএব কোনো কল্পনার সাহায্য না নিয়ে হৃদয়াদি অধ্যাত্ম-প্রদেশে কেউ যদি চিত্তকে বেঁধে রাখে, তা-ও ধারণা। দেহের এক-একটা কেন্দ্রে এক-এক রকমের চিৎশক্তি সুপ্ত আছে। ধারণার ফলে সেই সুপ্ত শক্তি জেগে উঠবে। এই চিৎশক্তিগুলির বৈশিষ্ট্যের কথা আগেই বলেছি, পুনরুল্লেখের প্রয়োজন নাই।

এখন একটা ব্যাপারে সাবধান করে দিই। সৌষুম্ণ-ভাবনার দ্বারা ধারণাকে আয়ত্ত করতে চাও যদি, তাহলে প্রথমতঃ শক্তি-স্রোতকে হৃদয় পর্যন্ত নামিয়ে আনবে, তার নীচে তাকে যেতে দেবে না। ফলে হৃদয়ে যদি বিশোকা জ্যোতির আবির্ভাব হয়, তাহলে সেই জ্যোতির সহায়েই শক্তিস্রোতকে মণিপুরে, স্বাধিষ্ঠানে এবং

মূলাধারে নিয়ে যাবার সাধনা করবে। ডুবুরিরা সমুদ্রে নামে, কিন্তু তাদের কোমরের দড়িটা থাকে জাহাজের উপরে মাল্লাদের হাতে। বিপদ-আপদ ঘটলে মাল্লারা তাদের টেনে তোলে। হার্দ-জ্যোতির প্রতিষ্ঠা হলে সেই শক্তিই ভোগবতী ধারায় ভাটিয়ে যাবার সঙ্কেত বলে দেয়, তার জন্য আলাদা করে আর চেষ্টা করতে হয় না। এইটুকু খেয়াল থাকে না বলে অনেক সাধক মণিপুরে আচম্‌কা ঢুকতে গিয়ে বিপদে পড়ে।

এতক্ষণ ধারণা-প্রসঙ্গে যা বললাম, তা মোটামুটি সংহরণের অর্থাৎ চেতনাকে গুটিয়ে আনবার কৌশল। এ-সব ধারণা হল দৈহ্য ধারণা। এ ছাড়া আরেক ধরণের ধারণা আছে, পতঞ্জলি তাকে বলেছেন বিদেহ ধারণা। এ-ধারণা জ্ঞান-যোগীদের। তার মূল কথাটা হচ্ছে, ভূতগুণকে ধারণার দ্বারা যোগগুণে পরিণত করা।

এই ধরণের ধারণাতেও সাধনা শুরু করতে হয় দেহ থেকেই, কিন্তু অন্তর্ধারণার মত দেহকে লক্ষ্য করেই সাধনা করবার প্রয়োজন হয় না। দেহটা তখন সাধনার উপলক্ষ্য-মাত্র হয়ে থাকে ;

সাধনার জন্য দুটি বিষয়ের জ্ঞান দরকার। প্রথমতঃ ভূতগুণ সম্বন্ধে একটা সুস্পষ্ট বোধ হওয়া চাই, দ্বিতীয়তঃ কিছুদিন ধরে পর্যবেক্ষণ দ্বারা দেহবোধের পরিণামগুলোকে লক্ষ্য করে তাদের সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়া চাই। ভূতগুণের পরিচয়টা সুন্দরভাবে দিয়েছেন বৌদ্ধযোগীরা। তাঁদের মতে পৃথিবীর গুণ কাঠিন্য, জলের গুণ সংসক্তি, অগ্নির গুণ তেজ, বায়ুর গুণ প্রণামিত্ব, আকাশের গুণ শূন্যতা। তার মধ্যে সংসক্তি মানে আলাদা হয়েও গায়ে গায়ে লেগে থাকা, আর প্রণামিত্ব মানে প্রবহন-শীলতা। জড়বিজ্ঞানের সাহায্যে বিষয়টা বোঝবার সুবিধা হবে।

জড়বিজ্ঞান জড়ের তিনটি অবস্থার কথা বলে—কঠিন, তরল আর বায়ব্য। পদার্থের কঠিন অবস্থায় তার অণুগুলো খুব ঘন আর ঠাসাঠাসি হয়ে থাকে। যদি তাপ প্রয়োগ করা যায়, তা হলে অণুগুলো ছাড়াছাড়া হয়ে পড়ে, তাদের মাঝে স্পন্দন বা কম্পন বাড়তে থাকে। এই সময়ই কঠিন পদার্থ তরল পদার্থে পরিণত হয়। আরও তাপ পেলে আরও স্পন্দন বাড়ে এবং সঙ্গে সঙ্গে পদার্থের আয়তন অসম্ভব ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে সামান্য-পরিমাণ বায়ব্য পদার্থও আধারের সবটুকু অবকাশকে পূর্ণ করে ফেলতে পারে।

এই বর্ণনার মাঝে চারটি ভূতগুণের সন্ধান পাচ্ছি—ক্ষিতির কাঠিন্য, জলের তারল্য, অগ্নির তাপ আর বায়ুর ছড়িয়ে পড়া। তাপটা হল মূল পরিণামিণী শক্তি। যতক্ষণ দেহ আছে, ততক্ষণ এই চারটি গুণের ক্রিয়া হবে। দেহ শূন্যবৎ হয়ে গেলে পঞ্চম ভূতগুণ শূন্যতার আবির্ভাব হয়।

পঞ্চভূতের দুরকম গুণ পাওয়া যাচ্ছে তাহলে। যে পঞ্চভূত দিয়ে বাইরের জগৎ গড়া, তাদের থেকে আমরা পাচ্ছি জ্ঞানেন্দ্রিয়গ্রাহ্য পাঁচটি গুণ—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ। এগুলো আবার আমাদের ভিতরে এসে পঞ্চতন্মাত্রে পরিণত হচ্ছে। এদের অবলম্বন করে যে-সাধনা চলে, তার কথা ধ্যানের প্রসঙ্গে বলব।

আবার পঞ্চভূত দিয়ে আমাদের দেহ তৈরী হয়েছে। তখন ভূতগুণ কিন্তু আর ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়, বোধগ্রাহ্য। অর্থাৎ আমাকে আমি দেখি না, বা আস্বাদন করি না, অথচ আমার শরীরস্থ ভূতের এক-একটির প্রাধান্যের ফলে সমগ্রভাবে দেহবোধের যে-রূপান্তর হয়, আমি সেটা অনুভব করি। হঠযোগীরা একে বলেন, তত্ত্বের উদয়।

তাঁরা এ-ও বলেন, সারাক্ষণ পর্যায়ক্রমে এই তত্ত্বের উদয় হয়ে ভিতরে-ভিতরে আমাদের দেহবোধের রূপান্তর ঘটছে—আমরা বহির্মুখ হয়ে আছি বলে তা ধরতে পারি না।

সে যাই হোক, দেহবোধের সঙ্গে ভূতের যোগগুণকে জড়িয়ে নিয়ে ধারণার সাধনা চলতে পারে। তাকে বলে ভূত-ধারণা। এর মধ্যে একটা ধারণার আভাস আমরা আগেই পেয়েছি—আসন-সাধনার সময়। আসনে বসে ভাবনা করতে হয়, আমার শরীর যেন জমে পাথর হয়ে গেছে, যে-মাটির উপর বসে আছি, তার সঙ্গে ও-যেন এক হয়ে গেছে, উইয়ের ঢিপির মত শরীরটা যেন মাটিরই একটা ঢেউ। এই ভাবনার ফলে শরীরের যে সম্পূর্ণ স্থৈর্যের বোধ, তাই হল কাঠিন্য নামের যোগগুণ। দৈহ্য চেতনায় এই গুণের আবির্ভাব হলে ক্রমে দেহবোধের সূক্ষ্মতর পর্যায়গুলো অনুভবে আসে। তখন আর এই স্থূলদেহের বোধ থাকে না। অনুভব হয়, ভিতরে আর-একটা শরীরের যেন আবির্ভাব হয়েছে।

প্রথম আবির্ভাব হয় আপ্য-শরীরের। এই শরীরের বোধ কিশোরতনুর বোধ, বৈষ্ণব কবির বর্ণনায় যাকে বলা চলে: 'ঢলঢল কাঁচা অঙ্গের লাবণি, অবনী বহিয়া যায়'। এই আপ্য-শরীরের আবির্ভাবে রসচেতনার স্ফুরণ হয়। সেই সঙ্গে আরেকটি গুণ দেখা দেয়, সাবলীলতা (plasticity)। দেহবোধের কোথাও তখন কোনও আঁট থাকে না, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তও হয়ে যায় বিগলিত। ফলে অপরের যে-কোনও ভাবের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে তার বাধা থাকে না। এই অবস্থাকে বলা চলে চিত্তের গলিতা বৃত্তি। অথচ ক্ষিতির গুণ যে কাঠিন্য, তা কিন্তু এর সঙ্গে বজায় থাকে। এ যেন পাথরের

বুকে ঢেউ খেলার মত। আসনে বসে এ অনুভবটা পাওয়া কঠিন নয়—একদিকে শরীর নিস্পন্দ অথচ ভিতরটা যেন এলিয়ে পড়েছে, কাঠিন্য আর তরলত্ব দুটোর বোধ একসঙ্গে হচ্ছে। কাঠিন্যের বোধটা বজায় রাখা একান্ত প্রয়োজন—নইলে আপ্য-শরীরের আবির্ভাবে রসের বিকার ঘটবার সম্ভাবনা আছে। উপনিষদ্ বলেন, 'পৃথিবী পাজস্যম্'—পৃথিবী হচ্ছে খুঁটি। এই খুঁটি আলগা হতে দিলে চলবে না। প্রত্যেকটি ভূতগুণকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে রাখতে হবে। গুণের আবির্ভাব হবে, তার লীলায়ন দেখা দেবে, কিন্তু তুমি থাকবে তার সাক্ষী—এই কথাটি যেন মনে থাকে।

এই সাক্ষিভাবনা অটুট থাকলে স্বভাবের নিয়মেই আপ্য-শরীরের পর তৈজস শরীরের আবির্ভাব হবে। জলে তখন আগুন ধরে যাবে। বৈদিক ঋষি একেই অপ্ হতে অগ্নির আবির্ভাব বলে বর্ণনা করেছেন। বলেছেন—জলবালাদের বুকে কোথা হতে এল এই আলোর শিশু? এই আলোর শিশুই কুমার। এর আবির্ভাবে চিত্তের যে-অবস্থা হয়, তাকে বলা চলে 'জ্বলিতা বৃত্তি'। পার্থিব শরীর তখনই যোগাগ্নিময় হয়।

এই পর্যন্ত পৃথিবীর অধিকারে, রূপের রাজ্যে। এরপর তৈজস শরীরের ব্যাপ্তিতে বায়ব্য শরীরের আবির্ভাব হয়, বৈদিক ঋষির ভাষায় অগ্নি তখন হন বৈশ্বানর। বায়ব্য শরীর বিশ্বচেতনার (cosmic consciousness-এর) বাহন। রূপ এখানে অরূপ, আছে শুধু সর্বব্যাপী শক্তির বোধ। তারপরে সেই শক্তিও নিস্পন্দ হয়ে যায়। বায়ু পরিণত হয় আকাশে, শক্তি ভাবে, দেহ বিদেহে। একেই পতঞ্জলি বলেছেন, মহাবিদেহ ধারণা। এর কথা পরে আসবে।

এই হল ব্যাপ্ত্যাত্মক ধারণার মোটামুটি ছক। বুঝতেই পারছ, এর আসল লক্ষ্য হচ্ছে—পিণ্ডদেহকে ব্রহ্মাণ্ডদেহে রূপান্তরিত করা। তোমার দেহ পঞ্চভূতে তৈরী, কিন্তু পঞ্চভূত তার মধ্যে বিশুদ্ধ হয়ে নাই। অন্যোন্যমিশ্রণ তো আছেই, তা ছাড়া আছে অন্যোন্যাভিভব—অর্থাৎ ভূতগুলো পরস্পরের সঙ্গে কেবল সংঘর্ষ বাধাচ্ছে। এই সংঘর্ষের ফলে দেহে প্রাণশক্তি ক্ষুণ্ণ এবং বিকল হচ্ছে। তাইতে আমাদের মধ্যে জরা, ব্যাধি আর মৃত্যু দেখা দিয়েছে। হাজার-হাজার বছর ধরে ভারতবর্ষের যোগীরা চেষ্টা করে আসছেন প্রাণের এই বিকার-গুলোকে জয় করতে। এই হচ্ছে 'বিজরো বিমৃত্যুঃ' হবার সাধনা—শুধু চেতনায় নয়, প্রাণে এবং দেহেও। এই সাধনাকে নানা নাম দেওয়া হয়েছে। উপনিষদ্ এক জায়গায় একে বলেছেন 'ধাতুপ্রসাদের' সাধনা; 'ধাতু' কিনা আধারের মৌল উপাদান, তার 'প্রসাদ' কিনা স্বচ্ছতার সাধনা। উপনিষদ্ আর এক জায়গায় একে বলেছেন—শরীরকে যোগাগ্নিময় করা। এটা ঐ ধাতুপ্রসাদের সাধনার চাইতে আরও গভীর, কেননা এখানে শুধু প্রকৃতির অনুসরণ নয়, পুরুষের তীক্ষ্ণ বিবেকজ্ঞানও দরকার। পতঞ্জলি আরও গভীরে গিয়ে এ-সাধনাকে বলেছেন 'ভূতজয়'। তার অর্থ, পুরুষের বিবেকদৃষ্টিকে পূর্ণ জাগ্রত করে পঞ্চভূতের গুণকে নিজের অধিকারে আনা। খুব কঠিন সাধনা, কিন্তু ফল আরও স্থায়ী হয়।

এই সব সাধনার ভিতর দিয়ে যোগীরা দৈহ অমরত্বের একটা সম্ভাবনাকে রূপ দিতে চেয়ে এসেছেন। অনেক যোগীই আকাশভূতকে জয় করে মহাবিদেহ ধারণায় প্রতিষ্ঠিত থাকেন, বৈশ্বানর-ভাবনায় তৈজস শরীরে থাকাও অসম্ভব নয়। কিন্তু ভাবময় আপ্য-শরীর এবং

বজ্রসংহত পার্থিব শরীরে প্রতিষ্ঠিত হওয়া এখনও প্রায় অসম্ভবের শামিল।

ধারণার কথা এইখানেই শেষ করি। এর আরও নানা সূক্ষ্ম ভেদ আছে, কিন্তু সেগুলো নিয়ে আলোচনা করে পুঁথি বাড়িয়ে লাভ নেই। মোটের উপর এইটুকু মনে রেখো, আসলে ধারণার অর্থ দৈহ্য-বোধকে উদ্দীপ্ত করা। প্রত্যাহার বা অন্তর্মুখীনতা দিয়ে তার শুরু। তার দুটি ছন্দ—একটি ভিতরপানে গুটিয়ে আসা, আর একটি বাইরে ছড়িয়ে পড়া। এই দুটি ছন্দই আয়ত্ত করতে হয়, নইলে সাধনা পূর্ণাঙ্গ হয় না। শুধু বাইরে ছড়ানো অভ্যাস কর যদি, একটা অবিচল শান্তির অনুভব পাবে, জগৎ সম্পর্কে একটা তটস্থ ভাব আসবে সেই সঙ্গে। বেদান্তীরা তাই করেন। এ-সাধনায় মৃত্যুর অনুভবের উপরে ওঠা যায়। কিন্তু ভূতগ্রাম নিয়ে কারবার করতে হলে অর্থাৎ জীবনকে বীর্যময়, আনন্দময় এবং সার্থক করতে হলে অন্তর্ধারণার অভ্যাসও করতে হয়। বাইরের জগৎকে, খণ্ড অনুভবকে একেবারে সত্তার গভীরে টেনে আনতে না পারলে সর্বভূতে আত্মদর্শন কি করে সম্ভব হবে? বাইরের মাত্রাস্পর্শ যখন মেরুতন্ত্রীতে ঝঙ্কার তুলবে, তখনই পরকে আমরা আপন করতে পারব। এই সাধনাও তাই অপরিহার্য। ব্রহ্ম শুধু অনন্তে ছড়িয়ে নাই, তিনি আবার জীবে সংহতও। যেমন তিনি মহতো মহীয়ান্, তেমনি আবার অণোরণীয়ান্। তাঁকে দুটি রূপেই জানতে হবে। তাই দৈহ্য ধারণা এবং বিদেহ ধারণা দুয়েরই অভ্যাস দরকার। দুয়ে সামঞ্জস্য ঘটলে তবে ধারণার সাধনা পূর্ণ হবে। একেই বলে পিণ্ড-ব্রহ্মাণ্ডের ঐক্য।

৭

ধ্যানযোগ ঃ ত্রি-অঙ্গ

এইবার ধারণার পরের পর্ব—ধ্যান। ধারণার সাধনাতেই খানিকটা ধ্যানের সাধনা হয়ে যায়। তাই সচরাচর বলা হয়, ধারণা জমলেই তা রূপান্তরিত হয় ধ্যানে। বস্তুতঃ যোগের সব অঙ্গগুলিই ওতপ্রোত, আমরা তাদের বিশ্লেষণ করে একটা ছকে সাজিয়ে নিই বোঝবার সুবিধার জন্য। তবে এতে যোগাঙ্গগুলির লক্ষণজ্ঞান হয় এবং তাতে সাধনাও সুনিয়ন্ত্রিত হয়।

পতঞ্জলি ধ্যানের লক্ষণ বলেছেন ঃ 'তত্র প্রত্যয়ৈকতানতা ধ্যানম্।' 'তত্র' মানে সেই দেশে অর্থাৎ ধারণার সহায়ে যেখানে চিত্তকে বেঁধে রাখবার অভ্যাস করেছ—যেমন হৃদয়ে, ভ্রূমধ্যে, মূর্ধায়, সুষুম্ণানাড়ীতে অথবা বাইরের আকাশে। চলতে, ফিরতে, বসতে, শুতে, কথা বলতে বা কাজ করতে সবসময় অনুভব হচ্ছে ঐ দেশগুলি আমার স্বধাম, আমি ঐখানেই আছি। 'প্রত্যয়' শব্দের অর্থ হচ্ছে চিত্তের বৃত্তি। স্বাভাবিক চিত্তসত্ত্ব যেন স্বচ্ছ আলোর বিস্তারের মত। কিন্তু বিষয়ের সংস্পর্শে তারই মধ্যে নানা ফুট ফুটছে, বাতাসে পুকুরের ঢেউ ওঠার মত অনবরত ঢেউ উঠছে। এই ঢেউ ওঠাটা চিত্তের বৃত্তি। চিত্তবৃত্তির পিছনে চিত্তসত্ত্বের বিস্তারটা কিন্তু তেমনই শান্ত হয়ে আছে—আমরা সাধারণতঃ তা বুঝতে পারি না। সত্ত্বটা হল কারণ,

আর বৃত্তিগুলি হল তার কার্য। কার্যজ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কারণজ্ঞান হয় না, তাইতে আমরা কেবল বাইরে ছিটকে-ছিটকে পড়ি। ধারণা অভ্যস্ত হলে এই কারণজ্ঞানটা সহজ হয়। তখন নিজের মাঝে সবসময় যেন একটা স্বচ্ছ প্রশান্তির ভাব থমথম করতে থাকে। আমরা তখন হুঁশে থাকি, বাইরের টানে বাইরে যেতে হলেও বেহুঁশ হয়ে পড়ি না।

বাইরের হাওয়ায় চিত্তসরোবরে ঢেউ উঠছে। কিন্তু একটা ঢেউ কতক্ষণ স্থায়ী হচ্ছে? বোধহয় কয়েক সেকেণ্ডও নয়। ইন্দ্রিয়নির্ভর বহির্মুখ চিত্ত মুহূর্তে মুহূর্তে এক বিষয় থেকে আরেক বিষয়ে ছিটকে পড়ছে। কিন্তু এরই মধ্যে বুদ্ধি আবার অন্তরের ঔৎসুক্য দিয়ে একটা ধারাবাহিকতার সৃষ্টি করবার চেষ্টা করে। আমরা তাকে বলি মনোযোগ। মনোযোগে চিত্ত নিবিষ্ট হয়, তার ঢেউগুলির মাঝে একটা শৃঙ্খলা আসে। কিন্তু তবুও ঢেউ-এর ওঠাপড়া বন্ধ হয় না। তবে চিত্ত এতে খানিকটা অন্তর্মুখীন হয়।

অন্তর্মুখীন চিত্ত মনোযোগ দিয়ে বিষয়কে ধরে রাখবার চেষ্টা করছে। তাতে প্রত্যয়ের বা বৃত্তির খানিকটা ধারাবাহিকতা তার মধ্যে এসে যাচ্ছে। কিন্তু বৃত্তির উদয় হচ্ছে তখন বিশেষ করে বিষয়কে নিয়েই। সত্যকার বিষয়ী বা আমির প্রত্যয় কিন্তু এ-ক্ষেত্রে গৌণ। অথচ এই বিষয়ীর চেতনা স্বচ্ছ এবং স্পষ্ট না হওয়া পর্যন্ত বাস্তবিক বলা চলে না যে চিত্ত অন্তর্মুখীন হয়েছে। আবার এই অন্তর্মুখীনতার সঙ্গে বৃত্তির ধারাবাহিকতার একটা অনুপাত আছে। অর্থাৎ চিত্ত বিষয়ীকে আশ্রয় করে যতই অন্তর্মুখ হবে বা গভীরে ডুববে, ততই বৃত্তির ধারাবাহিকতা স্থায়ী হবে। একেই বলে

প্রত্যয়ের সত্যকার 'একতানতা'। প্রাকৃত চেতনার বেলায় দেখি, আমাদের জাগ্রতে এই ধারাবাহিকতা খুব কম, স্বপ্নেও তাই। কিন্তু সুষুপ্তিতে বলতে গেলে ধারাবাহিকতা সব চাইতে বেশী—যদিও চিত্তের বৃত্তি সেখানে নির্বিষয় আর বিষয়ীর জ্ঞানও আচ্ছন্ন। তবে ঐ সুষুপ্তির মাঝেই যোগের একটা বড় সঙ্কেত লুকিয়ে আছে। সুষুপ্তির অনুভবকে যদি আমরা জাগ্রতে সঞ্চারিত করতে পারি, অথবা জাগ্রতের স্বচ্ছতাকে যদি সুষুপ্তিতে নিয়ে যেতে পারি, তা হলে প্রত্যয়ৈকতানতার গোড়ার সূত্রটি খুঁজে পাব।

একটু বিশ্লেষণ করে ব্যাপারটা বোঝবার চেষ্টা করা যাক। প্রাকৃত ভূমিতে আমাদের চেতনা টিকে থাকছে বিক্ষেপের দ্বারা অর্থাৎ ধারাবাহিকতার অভাবের দ্বারা। এইজন্য আমরা একঘেয়েমি সহ্য করতে পারি না। একই ব্যাপারের যদি পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকে, তা হলে আমাদের চেতনা ঝিমিয়ে পড়ে। আসলে এই ঝিমিয়ে পড়াটা চিত্তের নিজের উৎসমুখে ফিরে যাওয়া। এ-ও একরকমের অন্তর্মুখ একতানতা। কিন্তু ঐরকম একতানতার কেউ সাক্ষী থাকে না। ঝিমিয়ে পড়লাম কি ঘুমিয়ে পড়লাম তো আমি ফুরিয়ে গেলাম। এমনি করে ফুরিয়ে যেতে আমরা চাই না, চাই জেগে থাকতে—অর্থাৎ বহির্মুখ থাকতে চাই সব সময়। বাইরের বিচিত্র উপলক্ষ্যে সাড়া দিয়ে দিয়ে চিত্ত যদি সজাগ থাকবার সুযোগ না পায়, তা হলে আমাদের যেন আর সময় কাটে না। কিন্তু যোগী চান ঠিক তার উল্টা। বাইরের জগতে তিনি ঘুমিয়েই থাকতে চান, জেগে থাকতে চান অন্তরে। বাইরের জগতে যদি বিক্ষেপের কারণ কম থাকে, দৈনন্দিন জীবন-যাত্রা যদি অনাড়ম্বর এবং সুশৃঙ্খল হয়, তা হলে সেটা

যোগজীবনের অনুকূল হয়। চিরকাল এই দেশের জীবনাদর্শ তাই ছিল বলে যোগজীবনের স্ফুরণও এখানে সহজ হয়েছে। বাইরের ঝামেলা না কমাতে পারলে যোগ হয় না। কুরুক্ষেত্রেও যোগস্থ থাকা—অনেক পরের কথা। দীর্ঘদিনের অভ্যাসে সেটা সম্ভব হতে পারে। আদর্শ হিসাবে কথাটা শুনতে খুব ভাল। কিন্তু লাফ দিয়েই কেউ গাছের আগায় উঠতে পারে না—এক ডাল থেকে আরেক ডাল ধরে ধীরে ধীরে উপরে উঠতে হয়।

সাধারণ মানুষও যদি কোনও বিষয়ে খুব একটা ধাক্কা খায় আর ভিতরে তাই নিয়ে কেবল তোলাপাড়া করতে থাকে, তা হলে সে-ও অন্তরে জেগে ওঠে। তোলাপাড়ার ব্যাপারটা যদি 'হেয়' হয় অর্থাৎ এমন কিছু হয় যাকে আমি তাড়াতে চাইছি কিন্তু পারছি না, তখন অন্তরে জেগে থাকাটা হয় দুঃখের। আর বিষয়টা 'উপাদেয়' হলে হয় সুখের। দুঃখের সঙ্গে তীক্ষ্ণতার আর চাঞ্চল্যের একটা সম্বন্ধ আছে, তেমনি সুখের সঙ্গে আছে চিত্তের বিস্ফারণের আর স্থৈর্যের। সুখী চিত্ত স্বভাবতই আলোর মত প্রশান্ত হয়ে ছড়িয়ে পড়তে পারে। এই অবস্থাটাও যোগের অনুকূল। এইজন্য সন্তোষকে একটা যোগাঙ্গ বলা হয়েছে। যা পাও তাতেই সন্তুষ্ট থাকার অভ্যাস চিত্তস্থৈর্যের সহায়তা করে।

কিন্তু লক্ষ্য রাখতে হবে, সুখ যেন বস্তুনির্ভর না হয়। সুখকে যদি তুমি বস্তুনির্ভর কর, তা হলে দুঃখকেও সঙ্গে সঙ্গে নিমন্ত্রণ করে আনা হবে। সুখের উপলক্ষ্য থাকলেই তবে যদি সুখ পাও, তা হলে উপলক্ষ্য না থাকলে দুঃখ পাওয়া অবধারিত হবে। তখন ইষ্টসমাযোগে সুখ, আবার ইষ্ট-বিয়োগে দুঃখ। এইজন্য চেষ্টা করতে

হবে, সুখ যতটা সম্ভব বস্তুনির্ভর না হয়ে যাতে আত্মনির্ভর হয়। তার একটা উপায় হচ্ছে, সুখকর বস্তুর সঙ্গে যোগ হওয়া মাত্র নিজের মধ্যে একটুখানি তলিয়ে গিয়ে বস্তুকে একান্ত করে না তুলে তোমার অন্তরের সুখময় বৃত্তিটাকে অথবা চিত্তসত্ত্বকে লক্ষ্য করা। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা বোঝা সহজ হবে। ভাল জিনিষ খেতে ভাল লাগে—এটা জানা কথা। কিন্তু আসলে ভাল লাগাটা তো বস্তুতে নয়—তোমাতে। তোমার শরীর যদি ভাল না থাকে, মন যদি ভাল না থাকে, তা হলে ভাল জিনিষও মুখে রোচে না। এখন ভাল জিনিষের আস্বাদ নেওয়ার সময় যদি মনে রাখ, স্বাদের সুখটা বস্তুতে নয়—তোমাতে, তা হলে সে-সুখকে দীর্ঘস্থায়ী করবার জন্য অনেকগুলো করে খাওয়ার দরকার হয় না। বাইরের বস্তুটা তখন সুখের উপলক্ষ্য মাত্র, আসল সুখের ধারা বয়ে চলে অন্তরে। বিষয় ভোগেও সংযম ও মার্জিত রুচির বোধ দেখা দেয় তখনই। হ্যাংলার মত ভোগ করতে তখন লজ্জা হয়।

এটা যে প্রত্যাহারের ব্যাপার, তা বুঝতে পারছ। বস্তুতঃ প্রত্যাহার স্বাভাবিক না হলে চিত্ত ধ্যানভূমিক হতে পারে না। কবি বললেন, 'একটুকু ছোঁওয়া লাগে, একটুকু কথা শুনি, তাই দিয়ে মনে মনে রচি মম ফাল্গুনী'। প্রত্যাহৃত চিত্তের এটি বড় সুন্দর পরিচয়। এই যে একটুখানি ছোঁওয়াতে বুক ভরে উঠল, অন্তরে রসের সমুদ্র উথলে উঠল—এটি একদিকে যেমন গভীর ভালবাসার লক্ষণ, তেমনি আবার ধ্যানচিত্ততার লক্ষণ। আধার স্ফটিকের মত স্বচ্ছ না হলে এটি হয় না। আধার স্বচ্ছ হয় ধারণার দ্বারা, তার কথা আগেই বলেছি।

এখানে আরেকটা কথা বলে নিই। মনে রেখো, ধ্যানচিত্ত না হলে ধ্যান সহজ হয় না। একটা নির্দিষ্ট সময়ের জন্য চিত্তের বৃত্তিকে একতান করার নাম হল ধ্যান। কিন্তু তার জন্য সমস্ত দিনব্যাপী নিজের অন্তরে একটা পরিবেশ রচনা করে চলতে হয়। ধ্যানে ইষ্টকে নিবিড় করে পাব। সে হল একান্তে পাওয়া, নির্জনে পাওয়া। কিন্তু অন্য সময়? তখনও মনটাকে ইষ্টের উপরই ফেলে রাখতে হবে। মহাপ্রভু একটি উদাহরণ দিয়েছিলেন, 'নষ্টা মেয়ে ঘরের কাজ নিয়ে ব্যস্ত হয়ে আছে, কিন্তু তবুও মনে মনে আস্বাদন করে চলেছে নব সঙ্গের রসায়ন।' তেমনি করে ইষ্টের সামীপ্যবোধকে সব সময় বহন করে চলা, যাতে ইষ্টস্মৃতি যেন মনকে নেশার মত পেয়ে বসে। এই নেশার ঘোরকে বলে ধ্যানচিত্ততা। সর্বক্ষণের জন্য ধ্যানচিত্ততা থাকলে তবে নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য ধ্যান জমে ভাল। আবার সেই ধ্যানের আবেশ ধ্যানের পরেও চিত্তকে জড়িয়ে থেকে ধ্যানচিত্ততাকে আরও নিবিড় করে তোলে। তখন নির্জনে যেমন তাঁকে পাই, তেমনি পাই সজনেও। ধ্যান তখন সার্বভৌম চিত্তধর্ম হয়ে দাঁড়ায়।

ধ্যানের অনুকূল পরিবেশ রচনা করতে হলে তাহলে এই কয়টি জিনিষ দরকার—জীবনযাত্রাকে সরল এবং সুশৃঙ্খল করা—যাতে নিরর্থক চিত্তবিক্ষেপের কারণ না ঘটে, যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট থাকার অভ্যাস করা—যাতে চিত্তে সব সময় একটা প্রসন্ন ঔজ্জ্বল্যের ভাব ছড়িয়ে থাকে, বিষয়-সংযোগে চিত্তের যে পরিণাম হয় তার দিকে লক্ষ্য রাখা—যাতে বিষয়-সচেতনতা রূপান্তরিত হয় আত্ম-সচেতনায়, আর সব সময়ের জন্য ধ্যানচিত্ততার একটা আবহ সৃষ্টি করা—

যাতে কখনও ইষ্টবিস্মৃতি না ঘটে। এর সঙ্গে আর একটি সাধনা যোগ করা দরকার—বাক্‌সংযম। শঙ্করাচার্য বলেন, 'মোক্ষের প্রথম দ্বার হল বাক্‌সংযম'। সারাক্ষণ যে বক্‌বক্ করে তার ধ্যান হয় না। বাক্‌সংযম সিদ্ধ হয় অজপা-জপে।

এখন তিনটি জিনিষকে একত্র কর—প্রত্যাহার, ধারণা আর ধ্যান। প্রত্যাহার হল চিত্তের স্বাভাবিক অন্তর্মুখীনতা—সুখকে আহরণ করা বিষয়ের পিছনে ছুটে নয়, বিষয়-সংযোগের অনুভবকে হৃদয়ের গভীরে তলিয়ে দিয়ে। একটু ভালবাসা থাকা চাই। প্রকৃতি হোক, মানুষ হোক, আদর্শ হোক—একটা কিছুকে ভালবাসা চাই। ভালবাসা হল চিত্তের হ্লাদিনী বৃত্তি। ঐ বৃত্তিতেই চিত্ত ধ্যানচিত্ত হতে পারে। ভালবেসে যে সুখ, ভালবাসার বস্তু থেকে সেই সুখময় বৃত্তিটুকু আলাদা করে নাও, অর্থাৎ সব প্রিয় বস্তুকেই অন্তরের ভাবে রূপান্তরিত করে তার ভাবময় সত্তার আস্বাদনে অভ্যস্ত হও। তোমার চিত্ত বস্তুমুখ না হয়ে তখন ভাবমুখ হবে। বস্তু হবে ভাবের উদ্দীপন মাত্র। বৌদ্ধের বিজ্ঞানবাদ, বৈষ্ণবের ভাববাদ—সব কিছুর মূলে এই সূত্র। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তু ভাবের প্রতীকমাত্র। প্রিয় তোমার বাইরে নয়, অন্তরে। তার মৃন্ময় রূপ ছায়া, কায়া হল তার চিন্ময় রূপ।

যা কিছু প্রেয়, তাকে এমনি করে যুক্ত করতে হবে শ্রেয়ের সঙ্গে। সমস্ত শ্রেয় সংহত হয়েছে এক পরম শ্রেয়ে—তিনিই তোমার ইষ্ট। তিনি নিঃশ্রেয়স—শ্রেয় আর প্রেয় তাঁরই বিভূতি। তিনি কারণ, এগুলি তাঁর কার্য। কার্যকে ছাপিয়ে পৌঁছুতে হবে কারণে, কারণজ্ঞানকে চেতনায় স্পষ্ট করে তুলতে হবে। এক তিনিই রূপে

রূপে প্রতিরূপ হয়ে ফুটছেন, এটি হল অবরোহ-জ্ঞান। এই অবরোহজ্ঞানটি অন্তরে পাকা হওয়া চাই। নইলে প্রত্যাহারের আরোহধারাকে কায়েমী করা যায় না। সুখের প্রত্যাহার যদি বা সহজ হয়, দুঃখের প্রত্যাহার হয় না। কিন্তু অবরোহজ্ঞান সুস্থির হলে সুখ-দুঃখ দুয়ের মাঝেই তাঁর সঙ্গসুধার আস্বাদ পাওয়া যায়। এতে চিত্ত অভয় হয় এবং বিক্ষেপের একটা বড় কারণ দূর হয়ে যায়। কারণজ্ঞানকে পটভূমিকার মত রেখে প্রত্যাহার দ্বারা ইষ্টকে অন্তরে জাগাবার অভ্যাস করতে হবে প্রথমে। তারপর তাঁকে দেহের ভিতরে বা বাইরে একটা দেশে যুক্ত করবার সাধনা কর। এটা হল প্রত্যাহারের সঙ্গে ধারণাকে জুড়ে নেওয়া। আগেই বলেছি, ধারণার সঙ্গে বোধের সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। ধারণার সাধনা আসলে দেহবোধকে চিন্ময় করবারই সাধনা। তাতে দেশবোধও চিন্ময় হয়ে যায়। ধ্যানের পক্ষে এটি অপরিহার্য। তোমার সত্তার যে সমস্ত প্রাকৃত বিভাব আছে, তাদের মধ্যে দেহটাই অপেক্ষাকৃত স্থির, আর ওটা একটা দেশ জুড়ে আছে। দেহবোধ আর দেশবোধ ওতপ্রোত। ভাবনার দ্বারা দুটি বোধকেই স্বচ্ছ করে তোলা যায়। তখন তাকে বলে সত্ত্বতনু। ভাবকে এই সত্ত্বতনুতে স্থাপন করলে সহজে তা জমাট বাঁধে। আবার দেহের অনুভব তোমার সব চাইতে অন্তরঙ্গ বলে ভাবের আস্বাদনও সব চাইতে নিবিড় হয় দেহেই। দেহের বাইরেও ভাবকে সর্বব্যাপীরূপে অনুভব করা যায়, কিন্তু সব সময় তাকে বজায় রাখা প্রথম প্রথম একটু কঠিন হয়। দেহ থেকেই বিদেহে ধারণা করাটা স্বাভাবিক এবং অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য। এইজন্যই এদেশে বরাবর কায়সাধনের উপর বিশেষ করে জোর

দেওয়া হয়েছে। আসন আর প্রাণায়াম দেহের মধ্যে স্থৈর্যগুণের আবির্ভাব ঘটিয়ে এবং তার আড়ষ্টতা ভেঙে দিয়ে ওটিকে লঘু স্বচ্ছ এবং আনন্দময় করে তোলে। এই আনন্দময় সত্ত্বতনুতে প্রত্যাহৃত ভাবের ধারণা সহজ ও সুখময় হয়। আর সেই সুখকে অবলম্বন করে প্রত্যয়ের একতানতাও অনায়াস হয় এবং তাইতে ধ্যান জমে। এই হল ধ্যানযোগের গোড়ার কথা। দেহ হাল্‌কা অথচ জমাট, প্রাণ নির্মুক্ত এবং মন অন্তর্মুখ হলে তবে প্রত্যয়ের একতানতা আসবে—এই হল সাধনার মূল সূত্র। এখন একতানতাকে প্রত্যয়ের দিক্ থেকে বিচার করা যাক।

৮

সমাধিযোগ ঃ ভাব ও ভাবনা

বিষয়ের যোগে চিত্তে যে-বোধের উদয় হয় তার সাধারণ নাম প্রত্যয়। বিষয় তোমার বাইরে থাকতে পারে, অন্তরেও থাকতে পারে। বাইরের বিষয়কে জানি ইন্দ্রিয় দিয়ে, অন্তরের বিষয়কে মন দিয়ে। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বিষয়ের যোগে আমাদের ভিতরে একটা নাড়া পড়ে, যোগের পরিভাষায় চিত্তসত্ত্বের (essence of consciousness-এর) পরিণাম (modification) ঘটে। ব্যাপারটা হল অনাত্মপদার্থের সঙ্গে (তা অজৈব বা জৈব দুই-ই হতে পারে) আত্মপদার্থের সংযোগ এবং আত্মপদার্থের ঐ অনাত্ম-পদার্থকে আত্মসাৎ করবার চেষ্টা। এইজন্য জ্ঞানের ব্যাপারকে যোগীরা এবং উপনিষদের ঋষিরা আহারের সঙ্গে তুলনা করেছেন। খেয়ে যেমন দেহের পুষ্টি, তেমনি ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়গ্রহণেও চিত্তের পুষ্টি। আহারে যেমন রুচিভেদ আছে, তেমনি বিষয়গ্রহণেও আছে। সব বিষয় সবার কাছে অনুকূল নয়। যা অনুকূল তাকে পেলেই চিত্তের সুখ ; যা প্রতিকূল তা সুতরাং তার হেয়। কার কি অনুকূল বা প্রতিকূল, তা নিরূপিত হয় সংস্কারের দ্বারা। যে-বিষয় অনুকূল অতএব উপাদেয়, তাতে ঔৎসুক্যকে জাগিয়ে রাখা যায় অনেকক্ষণ ধরে। তাই 'অভিমত' বিষয়ে প্রত্যয়ের একতানতা আসার সম্ভাবনা বেশী। পতঞ্জলি বৃত্তি-নিরোধের নানা উপায় বলে অবশেষে বললেন, 'যথাভিমতধ্যানাদ্

বা'—যার যেটা মনে ধরে, সেই বিষয়কে অবলম্বন করে ধ্যান প্রবর্তিত হলে চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে যায়।

এইখানে একটা কথা বলে নিই। চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা বা নিরোধ দুই-ই যোগ। ওতে একটা আত্মহারা তন্ময়তার ভাব আসে। তা-ই হল ধ্যানের পরিণাম সমাধি। কিন্তু যোগীরা বলেন, সমাধি একটা সার্বভৌম চিত্তধর্ম, অর্থাৎ চিত্তের সব ভূমিতেই সমাধি হতে পারে। চিত্তের পাঁচটা ভূমি আছে—মূঢ়, ক্ষিপ্ত, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র আর নিরুদ্ধ। এদের মধ্যে শেষের দুটাই হল যোগভূমি। সমাধি অযোগের ভূমিতেও হতে পারে। প্রতিদিন ঘুমের মধ্যেও তো চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। সুতরাং ঘুমও একরকমের সমাধি। বলা যায়, ওটা মূঢ়ভূমির সমাধি। ওতে তমোগুণ প্রবল হয়ে বৃত্তিনিরোধ হয়। তাইতে ঘুমের ফলে কারও স্বরূপজ্ঞান হয় না, যদিও ঘুমের মধ্যে জেগে থাকবার কৌশল আয়ত্ত করতে পারলে কিন্তু তা হতে পারে। সে-কথা পরে হবে। আসলে দেখতে পাচ্ছি, ঘুম থেকে জাগবার পর যে-মানুষ সে-ই মানুষই থাকে, তার স্বভাবের কোনও পরিবর্তন হয় না। তেমনি কোনও তীব্র রাজসিক উত্তেজনার ফলেও একরকম আত্মহারা তন্ময়তা আসতে পারে। ওটা হল ক্ষিপ্তভূমির সমাধি। ওতেও স্বরূপজ্ঞান হয় না। আবার আছে বিক্ষিপ্তভূমির সমাধি। যেমন কোনও জ্ঞান বা ভাবের বিষয়কে অবলম্বন করে কেউ আত্মহারা হয়ে গেল। দার্শনিক, বৈজ্ঞানিক, কবি বা ভাবুককে এইরকম আত্মহারা হতে দেখা যায়। বুঝতে হবে, চিত্তে তখন তমোভাব বা রজোভাব দমিত হয়ে সত্ত্বগুণের স্ফুরণ হয়েছে। তমের লক্ষণ হচ্ছে আচ্ছন্নতা, রজের উত্তেজনা, আর সত্ত্বের

উদ্দীপনা। উদ্দীপনায় চিত্ত স্বচ্ছ আর লঘু হয়। এ-অবস্থাটা যোগের অনুকূল। কিন্তু এতে স্বরূপজ্ঞান না-ও হতে পারে। আসল কথা, বিক্ষিপ্তভূমিতে চিত্তবৃত্তি সাময়িকভাবে একাগ্র বা নিরুদ্ধ হয়—কিছুক্ষণের জন্য একটা নেশার ঘোর লেগে থাকে, তারপর আবার রাজসিক চাঞ্চল্য বা তামসিক অবসাদ দেখা দেয়। বেশ বোঝা যায়, চিত্ত সত্ত্বগুণের সহায়ে স্বরূপকে ছুঁই-ছুঁই করেও ছুঁয়ে আসতে পারেনি। তাই শুদ্ধসত্ত্ব বা শুদ্ধ-চৈতন্যের আভাস পেয়েও তাকে চিনতে পারা বা ধরে রাখা তার সম্ভব হয়নি।

আসল কথা হচ্ছে, বিবেকজ্ঞান না হলে স্বরূপদর্শন হয় না। বিষয় দুরকমের—একটা আত্মবিষয়, আরেকটা অনাত্মবিষয়। অনাত্মবিষয় তোমার বাইরে; আর আত্মবিষয় তুমি নিজে। 'নিজে' বলতে বলছি তোমার শুদ্ধচৈতন্যের কথা—সে-চৈতন্য শান্ত উজ্জ্বল প্রসন্ন এবং আপনাতে আপনি মগ্ন অর্থাৎ অন্তর্মুখ। চৈতন্য সবারই আছে—পশুপাখি-কীটপতঙ্গেরও আছে। কিন্তু আত্মচৈতন্যের বোধ সবার নাই। এই আত্মচৈতন্যকে আবিষ্কার করতে হয় বিবেক দিয়ে। যে-আমি বিষয়ের সঙ্গে জড়িয়ে আছি—সে-আমি নয়, যে-আমি তার থেকে তফাত হয়ে আপনাতে আপনি আছি, সেই আমিই সত্যকার আমি, সেই আমিই যোগী। সে-আমি জ্ঞানী হতে পারি, ভক্তও হতে পারি। কিন্তু তার একটা বিশেষ লক্ষণ, তার গভীরে নির্মল তটস্থ সত্তার একটা অনুভব আছেই আছে। সে যেন মায়ের বিবেকানন্দ ছেলে, সংসারের সব-কিছু থেকে সে আলাদা। আর সে স্ফটিকের মত স্বচ্ছ, তাতে বাইরের কোনো রংই ধরে না। এই শুদ্ধ আত্মচৈতন্যের ভাবনায় স্থির হয়ে যদি চিত্তের বৃত্তি একাগ্র হয় বা নিরুদ্ধ হয়, তা হলেই যোগের সমাধি হবে, নইলে নয়।

এখন আবার অভিমত বিষয়ের কথায় ফিরে যাই। শুদ্ধ আত্মচৈতন্যকে ভূমিকা করে অভিমত বিষয়ের দিকে চিত্তের বৃত্তিকে প্রবাহিত করলে পরে 'ভাব' জাগে। যোগীরা বলেন, তখন চিত্তে সত্ত্বগুণের উদ্রেক হয়। ভাব যেন চেতনার আলো-ঝলমল একটা পরিমণ্ডল। এই পরিমণ্ডলকে অনুভব করতে হবে আত্মচৈতন্যেরই ছটা বলে। অর্থাৎ বিষয়-সংযোগে যে-ভাব জাগল, তাকে বিষয় হতে প্রত্যাহৃত করে যুক্ত করতে হবে বিষয়ীর সঙ্গে, কিনা, আত্মচৈতন্যের সঙ্গে। অনুভব করতে হবে, ভাবটা বিষয়ের ধর্ম নয়, তোমারই আত্মচৈতন্যের ধর্ম। তা হলেই ভাব ধ্যানের অনুকূল হবে।

একটা উদাহরণ দিলে কথাটা হয় তো স্পষ্ট হবে। ধরা যাক্, একটা সুন্দর ফুল দেখে তোমার মনে আনন্দ হল। স্বভাবতই তুমি চাইবে, এ-আনন্দটা স্থায়ী হোক। গোড়াতেই তুমি ধরে নিয়েছ, আনন্দ ঐ ফুলে, সুতরাং আনন্দকে স্থায়ী করতে হলে ফুলটাকে স্থায়ী করা দরকার। তার নানা উপায় আছে। সেই উপায়গুলি অবলম্বন করে ফুলটাকে বাইরে রেখে যদি তাকে উপভোগ কর, তা হলে তাতে হবে ভোগীর সুখ। কিন্তু আসলে ব্যাপারটা হয় তো অন্য-রকম। আনন্দ ফুলে নাই, আছে তোমাতে। তোমার স্বরূপানন্দের উপলক্ষ্য হল মাত্র ঐ ফুলটি। আসলে ফুল ফুটেছে বনে নয়—মনে। বনের ফুলের দিক্ থেকে দৃষ্টি ঘুরিয়ে ফেলতে হবে ঐ মনের ফুলটার উপর অর্থাৎ বিশুদ্ধ আনন্দানুভবটির উপর। তাকে স্থায়ী করবার জন্য বাইরের কোনও তোড়জোড়ের দরকার হয় না—দরকার হয় শুধু প্রত্যাহারের এবং ধৃতির। ধৃতি ধারণার গুণ। অন্তর্ধারণার

অভ্যাসের ফলে যদি আধার স্বচ্ছ হয়ে থাকে, তা হলে ঐ ফুলটি গিয়ে ফুটবে ভিতরেই কোনো চিৎকেন্দ্রে—যেমন হৃদয়ে বা সুষুম্ণতন্তুতে বা ভ্রূমধ্যে। সেখানে গিয়ে স্থূল ফুল সূক্ষ্ম হবে, সূক্ষ্ম ফুল আনন্দময় হবে, আনন্দময় ফুল বোধময় হবে।

এমনি করে বিষয়ের অনুভব ধাপে-ধাপে চলে যায় শুদ্ধবোধের দিকে। তার পারিভাষিক নাম হল 'সমাপত্তি'। তার কথাও পরে বলব। এমনি করে বিষয়ের বিশুদ্ধ আনন্দসত্তার সম্ভোগে যোগীর সুখ। এই কৌশলটি আয়ত্ত করতে হবে: ইন্দ্রিয়ের কাছে যা কিছু ধরা দিচ্ছে, তার দিকে ছুটে গিয়ে নয়, আত্মচেতনার গভীরে তার অনুভবকে তলিয়ে দিয়ে। সুষুম্ণতন্তুকে এই গভীরতার প্রণালিকা ধরে নিলে সাধনাটা সহজ হয়। বুকের সামনে সংসার, আর মেরুদণ্ডের পিছনে এক অনন্ত চৈতন্যের অতল প্রশান্ত পারাবার। সংসারের ঢেউ বুকে আছড়ে পড়ে তলিয়ে যাচ্ছে পারাবারের ঐ প্রশান্তিতে। শেষশায়ী নারায়ণের ছবিতে যোগের এই সঙ্কেতটি ধরা আছে। শেষনাগ হল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সুষুম্ণতন্তু।

ভাবশুদ্ধি প্রবর্ত যোগীকে নিয়ে যায় ধ্যানচিত্ততার দিকে। এই ভাব জাগতে পারে প্রকৃতির কোনও বিরাট্ দৃশ্যকে অবলম্বন করে—যেমন পাহাড়ের উপর থেকে উপত্যকার দৃশ্য, বড় নদীর বয়ে চলা, সমুদ্রের বিস্তার, আকাশের আনন্ত্য, আলোঝলমল দিন ইত্যাদি। এগুলিতে চিত্তের উদ্দীপন হয়। অর্থাৎ বিষয়ের ঝামেলায় যে-চিত্ত উদ্বেজিত ও শ্রান্ত ছিল, তা শান্ত হয়ে যায়, তার মধ্যে একটা প্রসাদ-গুণ বা স্বচ্ছতা জন্মায়। চিত্ত যেন প্রাত্যহিক ক্ষুদ্রতার সঙ্কোচ হতে বৃহতের মাঝে মুক্তি পায়। মুক্তির মাঝে একটি সহজ প্রসন্নতার ভাব

আছে, বিরাট্ প্রকৃতির সংস্পর্শে সেইটি চিত্তে জাগলে প্রত্যয়ের একতানতা সুসাধ্য হয়।

ব্যাপারটার মূলে একটা কথা আছে। যোগীরা বলেন, আসন-সিদ্ধির দুটি সাধন—প্রযত্নশৈথিল্য (relaxation) আর অনন্ত-সমাপত্তি (expansion into the infinite)। বলতে গেলে এই দুটি সমস্ত যোগসাধনারই মূল কথা। সংসারে আমরা সব সময়ে চলছি আড়ষ্ট আর সঙ্কুচিত হয়ে। গুণ-পরানো ধনুর গুণে একটা টানের (tension) সৃষ্টি হয়। ওটা ব্যারাম। আর গুণটাকে আলগা করে দিলে আরাম। প্রাকৃত দশায় আমাদের দেহে-প্রাণে-মনে এ ধরণের একটা টান সব সময় আছেই। টানটা আরও বাড়ে, যদি অহঙ্কার প্রবল হয়। এটা হল অযোগের অবস্থা। ওতেই আমাদের মাঝে চাঞ্চল্য আর অবসাদ আসে। এ ছাড়াও রয়েছে পারিপার্শ্বিকের সঙ্কোচের বাধা। হয় চার দেয়ালের মাঝে আবদ্ধ হয়ে জীবন কাটাতে হচ্ছে, নয় তো চলতে হচ্ছে গলিপথ বেয়ে—কোথাও হাত-পা ছড়াবার একটু উপায় নাই। ওটাও অযোগের অবস্থা। যোগিচিত্তে এই আড়ষ্টতা আর সঙ্কোচ নাই।

প্রকৃতির মাঝেও নাই। বিপুল পৃথিবী, উদার আকাশ, ধ্যান-গম্ভীর পর্বত, নদীর প্রবাহ—সব কিছুর মাঝে রয়েছে স্বচ্ছন্দে নিজেকে ছড়িয়ে দেবার একটা ভাব। প্রকৃতির যোগে এই ভাবটি মানুষের চিত্তেও সঞ্চারিত হতে পারে। এর মাঝে ভাবনার পক্ষে সব চাইতে অনুকূল হল আকাশ—আলোঝলমল দিনের আকাশ অথবা তারায় ছাওয়া রাতের আকাশ। আকাশের মাঝে চিত্তটিকে ছড়িয়ে দিলে প্রযত্নশৈথিল্য আর অনন্তসমাপত্তি অনায়াসে সিদ্ধ হয়। এইটিই

ছিল সুপ্রাচীন বৈদিক সাধনা। উপনিষদের বহু জায়গায় তার উল্লেখ আছে। আকাশের ভাবনায় বাইরের আকাশ হৃদয়ে নেমে আসে, হৃদয় সঙ্কোচ আর আড়ষ্টতা হতে মুক্তি পায়। ধীরে-ধীরে তার মাঝে জোছনার আভা ফুটে ওঠে। সেই আভা সৌরপ্রভায় রূপান্তরিত হয়ে শেষে বিশোকা হার্দজ্যোতিতে নিত্য স্ফুরিত থাকতে পারে। তখন বাইরের আকাশে যেমন সূর্য, তেমনি হৃদয়ের আকাশেও সূর্য। একটি অধিদৈবত পুরুষ, আরেকটি অধ্যাত্ম পুরুষ। উপনিষদ্ বলছেন, দুটিই এক—যোঽসাবসৌ পুরুষঃ সোঽহমস্মি।

প্রকৃতির সঙ্গে নিজেকে মিলিয়ে চিত্ত যে প্রসন্ন হয়ে ধ্যানের অনুকূল হয়, এ-কথা নিরোধযোগীরাও জানতেন এবং মানতেন। তাই যদিও তাঁদের লক্ষ্য ছিল চিত্তকে ভিতরে তলিয়ে দেওয়া, তবুও সাধনার জন্য স্থাননির্বাচনের বেলায় তাঁরা শান্তরসাস্পদ জায়গাগুলি বেছে নেবার নির্দেশ দিতেন। এ-ও সেই একই ভাব—চোখ বুজলে যেমন হৃদয়ে দেখব আকাশের প্রশান্ত মহিমা, চোখ মেললেও তা-ই দেখব। ক্রমে বাইর-ভিতর এই বিরাটের সত্তায় পূর্ণ হয়ে উঠবে, চিত্তে ব্রহ্মাকারা বৃহতী বৃত্তিই জেগে থাকবে সব সময়।

প্রকৃতি আর মানুষ এই দুই নিয়ে আমাদের সংসার। প্রকৃতির পটভূমিকায় মানুষ। মানুষকে নিয়ে অনেক ঝামেলা। সেই ঝামেলা হতে মুক্তি পাই প্রকৃতির মাঝে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়ে। তবে চিত্তে যদি শান্তরসের একটি আবহ সৃষ্টি হয়, তা হলে সেই ভূমিকায় স্থিত হয়ে মানুষের সঙ্গে কারবার করা সহজ হয়। মানুষকেও দেখছি আলো বাতাস নদী পর্বত গাছপালা সব কিছুর সঙ্গে মিশিয়ে।

তাকে বৃহতের মাঝে স্থাপিত করে দেখছি বলে তার ক্ষুদ্রতা আমাকে আর তেমন করে ক্ষুব্ধ করছে না।

এ-সবই হল ক্রিয়াযোগের কথা। ক্রিয়াযোগ কিনা চলতে-ফিরতে যোগ। সব ছেড়ে-ছুড়ে একান্তে বসে যোগ করা সবার সাধ্য নয়, কিন্তু ক্রিয়াযোগ সবার জন্য। অথচ অষ্টাঙ্গ-যোগেরও যা ফল, এরও তা-ই ফল। পতঞ্জলি বলেন, এতেও অবিদ্যাদি পঞ্চ-ক্লেশ ক্ষীণ হয়, সমাধিভাবনা সহজ হয়।

যোগের মূল হল চিত্তপ্রসাদন। চিত্তপ্রসাদন মানে চিত্তকে প্রসন্ন করা অর্থাৎ তাকে লঘু স্বচ্ছ প্রভাময় আনন্দে পূর্ণ করা। আকাশ-ভাবনায় এটি হতে পারে, তা দেখেছি। এ-ভাবনা নির্জনে হতে পারে। কিন্তু মানুষের মাঝে এলেই যে চিত্ত অপ্রসন্ন হয়ে ওঠে, আকাশে মেঘ দেখা দেয়। তা বলে এই দিক্‌টা বাদ দিলেও তো চলবে না! প্রকৃতি আর মানুষ দুয়ের মাঝেই যোগচিত্তের গতি অবাধ হবে, তার প্রসন্নতা কোথাও ক্ষুণ্ণ হবে না। নইলে জীবন আর যোগ এক হল না।

মানুষের সম্পর্কেও চিত্তকে প্রসন্ন রাখার উপায় হল ব্রহ্মবিহার। ব্রহ্মবিহার মানে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা আর উপেক্ষার সাধনা। কথাটা একটু ভেঙে বলা দরকার।

মানুষের জীবনে দ্বন্দ্ব আছে। দ্বন্দ্বগুলিকে মোটামুটি দুভাগ করা যেতে পারে—এক সুখ-দুঃখের দ্বন্দ্ব, আর পাপ-পুণ্যের দ্বন্দ্ব। একটা দ্বন্দ্ব পড়ে মনস্তত্ত্বের এলাকায় (psychological), আরেকটি ধর্মনীতির এলাকায় (ethical)। এই দ্বন্দ্ব অনুযায়ী মানুষকে চারভাগে ভাগ করা যেতে পারে—কেউ সুখী, কেউ দুঃখী, কেউ

পুণ্যবান, কেউ পাপী। এদের সংস্পর্শে এসে প্রাকৃত চিত্তে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। কতকগুলি সাধারণ প্রতিক্রিয়া এই : কারও সুখ দেখলে ঈর্ষা, দুঃখ দেখলে শোক, আবার আনন্দও। কাউকে ভাল কাজ করতে দেখলে সংশয়, বিদ্রূপ বা ঈর্ষা, আবার মন্দ কাজ করতে দেখলে ক্ষোভ বা ক্রোধ—বিশেষত কাজের লক্ষ্য যদি হয় দ্রষ্টা নিজে। এই বৃত্তিগুলির কোনোটিই যে প্রসন্ন নয়, তা বলাই বাহুল্য। চিত্তপ্রসাদনের জন্য যোগীকে প্রাকৃত প্রতিক্রিয়ার ধারা একেবারে উল্‌টে দিতে হবে। সেই প্রসাদানুকূল প্রতিক্রিয়াগুলি হল সুখে মৈত্রী—বন্ধুর সুখে যেমন সুখ হয়, তেমনি সবার সুখে সুখী হওয়া; দুঃখে করুণা—যার মাঝে সমবেদনা থাকলেও মোহ নাই, আত্মস্থতা হতে বিচ্যুতি নাই; পুণ্যে আনন্দ, আর পাপে উপেক্ষা কিম্বা নির্বিকার তটস্থভাব—গীতায় যাকে বলা হয়েছে বিগতজ্বরতা।

আকাশভাবনায় চিত্তে যদি আকাশের সংস্কার নিরূঢ় হয়ে যায়, তা হলে মানুষের সম্পর্কে এলেও তার ব্রহ্মাকারবৃত্তি এমনি করে অক্ষুণ্ণ থাকতে পারে।

এই হল মানুষের সঙ্গে সর্বজনীন সম্বন্ধের কথা। কিন্তু তার সঙ্গে কতকগুলি বিশেষ অনুকূল সম্বন্ধও আছে, তাতেও চিত্তপ্রসাদন ঘটে। বৈষ্ণবেরা পাঁচটি ভাবের কথা বলেন—শান্ত দাস্য সখ্য বাৎসল্য আর মধুর। তার মধ্যে তিনটি ভাবকে লৌকিক বলতে পারি—দাস্য, সখ্য আর বাৎসল্য। কাউকে বড় জেনে নিজেকে তার কাছে লুটিয়ে দিলাম—এইটি দাস্য। পিতামাতা বা গুরুজনের প্রতি যে-ভাব, তা দাস্যের মধ্যেই পড়ে। অকপটে একজনের কাছে হৃদয় মেলে ধরলাম, যেন তাতে-আমাতে এক প্রাণ—এইটি সখ্য। স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধও

এই সখ্যেরই অন্তর্গত। কারও প্রতি প্রতিপাল্যের ভাব হল বাৎসল্য। মোটের উপর ভাবের বিষয় আমার চাইতে বড় হলে দাস্য, সমান-সমান হলে সখ্য আর ছোট হলে বাৎসল্য। একই পাত্রকে অবলম্বন করে তিনটি ভাবের বিকাশ হতে পারে—চিত্তের স্বচ্ছতা আর ঔদার্য বাড়বার সঙ্গে-সঙ্গে। কিন্তু সব ভাবেরই মূল কথা হল—অহং থাকবে না, চিত্তে দ্বিধা বা সঙ্কোচ থাকবে না, হৃদয় খুলে যাবে। চাই সেবাবুদ্ধি। যেখানে বুভুক্ষা, সেখানে অভাব ; যেখানে সেবা, সেইখানেই ভাব। ভাবের বিষয় প্রাকৃত হলেও তাতে সেবা-বুদ্ধি আনতে পারলে তা চিত্তপ্রসাদনের অপ্রাকৃত কারণে পর্যবসিত হয়। আবার দেবতাতে বা গুরুতে ভাবের আরোপ করলে চিত্ত-প্রসাদন আরও সহজ হয়।

ভাবের সাধনায় অভিমত বিষয়ে চিত্তের তন্ময়তা স্বাভাবিক রীতিতেই এসে পড়ে। তাইতে ধ্যানচিত্ত গড়ে তোলার পক্ষে এটি খুবই অনুকূল।

৯

যোগ ঃ বহিরঙ্গ থেকে অন্তরঙ্গ

তা হলে দেখতে পাচ্ছ, চিত্তপ্রসাদনের তিনটি উপায় ঃ (১) প্রকৃতির শান্তি, জ্যোতি আর ঔদার্যের রূপে চিত্তকে ছড়িয়ে দাও, (২) অথবা যাকে তুমি ভালবাস তাকে idealise করে অর্থাৎ দেবতা করে তুলে তার মধ্যে চিত্তকে মুক্তি দাও, (৩) অথবা বিরাট্ মানবসমাজের প্রতি মৈত্রীভাবনায় চিত্তকে পূর্ণ কর। প্রথম সাধনাটি বৈদিক, দ্বিতীয়টি বৈষ্ণব, তৃতীয়টি বৌদ্ধ। এর মধ্যে বৈদিক সাধনাটিই অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য এবং নির্ঝঞ্ঝাট। তোমাদের আকাশভাবনার কথা অনেকবার বলেছি, তাতে খানিকটা অভ্যস্তও হয়েছ, সুতরাং এ-সম্বন্ধে আর আলোকপাত দরকার নাই। বেদ পড়ে, বৈদিকসাধনার মধ্যে যখন ঢুকবে তখন দেখবে এই প্রকৃতি-সাধনার ভিতর দিয়ে বৈদিক ঋষিরা মহাশক্তিকে যেভাবে নাড়া দিয়ে গেছেন, অধ্যাত্মসাধনার ইতিহাসে তার তুলনা নাই। এই যে supramental descent-এর কথা এত শোন, তারও সাধনা সহজ হবে যখন বৈদিক প্রকৃতি-সাধনাকে আয়ত্ত করতে পারব আমরা ; নইলে ঐ-সাধনার মাঝেও psychological ও intellectual দিক্‌টাই বড় হয়ে সিদ্ধিকে বিলম্বিত করবে। Intellectual সাধনা পুরুষের, তা ছাড়া কেউ vision দেখতে পায় না। কিন্তু সেই vision-কে রূপ দিতে পারে একমাত্র প্রকৃতিই—intellect-কে intuition ও sensation-এর plane-এ নামিয়ে এনে। তাই

supramentalisation-এর জন্য বৈদিক প্রকৃতি-সাধনা অপরিহার্য। কথাটা এখানে ইঙ্গিতে বলে গেলাম। তলিয়ে বোঝবার চেষ্টা করো, তা হলে 'সাবিত্রী'র দায়িত্বও বুঝতে পারবে।

বৌদ্ধ মৈত্রীভাবনাও ধ্যানচিত্ততার পক্ষে অপরিহার্য। মৈত্রী-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষা এই চারটির মধ্যে বুদ্ধদেব প্রথমটির উপরেই জোর দিয়েছিলেন বেশী, কেননা ঐটি আয়ত্ত হলে আর তিনটি আনুষঙ্গিকভাবে আপনিই আসে। বৌদ্ধধ্যানের প্রথমেই এই মৈত্রী-ভাবনার উপদেশ আছে—নিজেকে অফুরন্ত ভালবাসার একটা শক্তিকূট (dynamo) রূপে চিন্তা করে ভাবনা করতে হবে তোমার প্রেম, আনন্দ ও শুভেচ্ছা যেন দিকে-দিকে ছড়িয়ে পড়ছে। যেদিন চিত্ত ধ্যানে একাগ্র হতে চায় না, সেদিন খানিকক্ষণ মৈত্রীভাবনা করলেই একটা লঘু প্রসন্নতায় চিত্ত পরিব্যাপ্ত হয়ে আপনি জমে যায়।

প্রকৃতি-সাধনা আর মৈত্রী-ভাবনা অপেক্ষাকৃত সহজ, কেননা ও-দুটোই abstract এবং universal। বৈষ্ণবের ভাবের সাধনা একটু কঠিন—বিশেষতঃ ভাব যদি কোনও ব্যক্তিবিশেষে আরোপিত হয়। ভাবের বিষয়কে যদি abstract এবং idealise করে নাও গোড়া থেকে, তা হলে অবশ্য ঝামেলা মিটে যায়, যেমন রামকৃষ্ণ ভবতারিণীর উপর মাতৃভাব আরোপ করলেন। কিন্তু এই ভাব একটি মেয়ের উপর করতে গেলে, ধর, ব্রাহ্মণীর উপর—ব্যাপারটা অত সহজ হত না। রামকৃষ্ণের বেলাতেও হয়নি। ব্রাহ্মণী তাঁর সাধন-জননী ছিলেন বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে ব্রাহ্মণীরও ঊর্ধ্বে উঠতে হয়েছিল।

এইখানে ভাবের সাধনায় গুরুবাদের দোষ-গুণ দুই-ই দেখতে পাচ্ছ স্পষ্ট করে। একজন মানুষকে আঁকড়ে ধরতে পারলে ভাবের সর্বাঙ্গীণ চরিতার্থতা ঘটে বটে, কিন্তু সেখানেও যদি আসক্তি না ছাড়তে পার, তা হলে ভাবশুদ্ধি হবে না—ছেলেপুলেতে জড়িয়ে গিয়ে মানুষ যেমন অবিদ্যার সংসার করে, তেমনি গুরু নিয়ে, আশ্রম নিয়ে তুমিও আর-একটা অবিদ্যার সংসারই করবে। এইজন্যই গুরুবাদের বেলায় বারবার সাবধান করে দিয়ে বলি, ব্যক্তিকে দেখো না, চেতনাকে দেখ ; গুরুকে ঈশ্বরের চাইতে বড় কোরোনা, ঈশ্বরকে পাওয়া হল সব চাইতে বড় কথা—গুরু তার উপায় মাত্র।

দেখতে পাচ্ছ, ধ্যানচিত্ততার জন্য ভাবের সাধনা অপরিহার্য হলেও এ-সম্বন্ধে একটা বাধাও আছে। এই বাধাকে কী করে জয় করতে হবে, তা আলোচনা করতে গিয়েই ধ্যানের বিশেষ technique-এর পরিচয় আমরা পাব। এইবার তার প্রসঙ্গই তুলছি।

একেবারে কতগুলো গোড়ার কথা বলি। এই আলোচনায় এক কথাকে অনেক সময় ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে বলছি এইজন্য যে বিভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত থেকে একটা জিনিষকে দেখলে তার তত্ত্বটা মনের মধ্যে গভীর হয়ে বসে যায়।....

আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহার—এই তিনটি বহিরঙ্গ-সম্বন্ধে আশা করি একটা সুস্পষ্ট ধারণা হয়েছে। এই তিনটির উদ্দেশ্য দেহ-প্রাণ-মনের স্থৈর্য স্বচ্ছতা ও অন্তর্মুখীনতা সম্পাদন। দিনের মধ্যে নির্দিষ্ট সময় (বিশেষ করে সন্ধিক্ষণে) এগুলোর সাধনা যেমন করতে হবে, তেমনি এদের ভাবকে সারাদিনের চলা-ফেরা কাজ-কর্মের মধ্যেও বহন করতে হবে। আসন অর্থ তখন হবে, শুধু একজায়গায় বসে থাকা

নয়, চলাফেরাতেও একটা ছন্দ বজায় রাখা—যেমন সৈনিকরা কুচকাওয়াজ করে। অর্থাৎ তোমার সারাদিনের অঙ্গসঞ্চালনও ছন্দোময় হচ্ছে কিনা এটা লক্ষ্য রাখবে। অনেক জাতের এটা স্বভাবসিদ্ধ—যেমন জাপানীদের। আমাদের দেশের মেয়েদের অন্ন-পরিবেশনের মাঝে এমনিতর একটা সৌন্দর্য আছে। পণ্ডিচেরিতে Physical Education-এ দেহের গতিকে ছন্দোময় করবার উপর খুব জোর দেওয়া হচ্ছে। এটাও ঐ আসনের সাধনা—তার dynamic দিক্। তুমি নিজে এদিকে নজর রেখো, তোমার মেয়েদের মধ্যে এ-ভাবটা সঞ্চারিত করবার চেষ্টা করো। আমরা চালে-চলনে এত উচ্ছৃঙ্খল যে, কি করে আমরা যোগীর জাত বলে বড়াই করি, তা বুঝতে পারি না। এইজন্যই যোগ আমাদের জীবনে ঋতের সৃষ্টি করে না, জীবন থেকে পালিয়ে গিয়ে গুহায় বসে যোগ করাকেই আমরা একমাত্র যোগ বলে জানি।

প্রাণায়ামের এমনি একটা স্বাভাবিক ছন্দ আছে—যা তোমার ঐ dynamic আসনের সহচর। তোমার অঙ্গসঞ্চালন যদি ছন্দোময় হয়, আপনি দেখবে, নিশ্বাস-প্রশ্বাসও ছন্দোময় হচ্ছে। তবে এদিকে একটু নজর দেওয়া দরকার। ঠিক ঘুমের সময় যেমন deep and rhythmic breathing আমাদের সহজেই হয়, তেমনি জাগ্রতেও যাতে হয়, তার অভ্যাস করা উচিত। খুব কঠিন অভ্যাস নয়।

এমনি করে তোমার শারীরবৃত্তি (physiological functions-কে) যদি ছন্দোময় কর, আপনি মনোবৃত্তিও ছন্দোময় হবে। চিত্তে একটা স্থৈর্য ও গভীরতা আসবে, আঘাতে তুমি বিচলিত হবে না, অবস্থাবিপর্যয়ের মাঝেও চকিতে একটা সিদ্ধান্ত করবার ক্ষমতা

তোমার জন্মাবে। আর এইগুলিই হল Personality-র লক্ষণ। আমি বলি কি, যোগ শুধু চিত্তবৃত্তিনিরোধের জন্যই নয়, সে যোগ জীবনের জন্যও, তোমার Personality develop করবার, ব্যক্তিত্ব বিকাশের ঐ হচ্ছে একমাত্র বৈজ্ঞানিক উপায়।

বুঝতে পারছ নিশ্চয়, বহিরঙ্গ যোগাঙ্গকেও কেমন করে প্রাত্যহিক জীবনে রূপ দেওয়া সম্ভব হয়। এইটি যদি পার, তা হলেই গীতার মতে 'যোগস্থ' হয়ে কর্ম করবার অভ্যাস তোমাদের হবে। যোগ জীবনে শ্রী আনবে।

বহিরঙ্গ থেকে এসো অন্তরঙ্গে। অন্তরঙ্গ যোগাঙ্গ হল ধারণা-ধ্যান-সমাধি। এ তিনটি একেবারে ওতপ্রোত। ধারণা হতে সমাধি পর্যন্ত একটা ধারাবাহিক ব্যাপার। সমস্তটা হচ্ছে, কিছুক্ষণ আগেই যা বলেছি—বিষয়কে আহারের মত করে আত্মসাৎ করবার ব্যাপারের মত। বহিরঙ্গ যোগের সাধনায় সমস্ত সত্তাব্যাপী একটা যে প্রসাদগুণ (একটা লঘু স্বচ্ছ পরিব্যাপ্ত জ্যোতির্ময় ভাব) তোমার মধ্যে জাগবে, দেহের কোনও এক নাড়ীকেন্দ্রে (nerve-centre-এ) তাকে জমাট করাই হল ধারণা। সেইখানে একটা জ্যোতির ধারণা করতে পারলে ভাল হয়—যেমন হৃদয়ে চিৎসূর্য, ললাটে চন্দ্র, ভ্রূমধ্যে নক্ষত্র বা মূর্ধায় জ্যোৎস্নার সমুদ্র, অথবা সুষুম্ণাতে বিদ্যুৎরেখা ইত্যাদি। ঐ জায়গা-গুলো হবে তোমার স্বধাম। বিশ্বের সব কিছুকে টেনে আনতে হবে ঐ স্বধামে। ধর, তুমি ধারণার অভ্যাস করেছ। তখন কিন্তু সব সময় স্বভাবতই ভ্রূমধ্যে থাকবে—কেবল যেন তার মধ্যে তলিয়ে যেতে চাইবে। এটা প্রাথমিক অবস্থা। তারপর তলিয়ে যাওয়ার ক্রিয়াও থাকে না, শুধু ঐখানে স্বচ্ছ, গভীর ও ব্যাপ্ত একটা

বোধমাত্র থাকে। এইভাবে থাকাটা হল তোমার যোগস্থ থাকা। তারপর ঐখানে থেকে দুটি ক্রিয়ার অভ্যাস করতে হবে—ইচ্ছার (will) সংযম আর প্রক্ষোভের (emotion) সংযম। ইচ্ছা ওঠে তোমার ভিতর থেকে ; আর প্রক্ষোভ আসে বাইরে থেকে। এই দুটির উপরেই এমনভাবে কর্তৃত্ব করতে হবে যাতে তারা তোমায় যোগস্থ অবস্থা থেকে বিচলিত না করে। প্রথম কথা হচ্ছে, মনের মধ্যে কোনও ইচ্ছা উঠতে না দেওয়া। Will nothing। আমাদের মস্ত বড় একটা বাতিক হচ্ছে আজকাল জগতের হিত করা। এই বাতিকটাও ছাড়তে হবে। জগতের হিতের কথা তুমি ভাববার আগেও যাঁর জগৎ তিনি নিশ্চয়ই কথাটা ভেবে রেখেছেন এবং তাঁর সত্য সঙ্কল্পের ফলে নিশ্চয়ই জগতের হিত হচ্ছেই। হঠাৎ ওটা নিয়ে তোমার খেপে ওঠাটা একটু বাড়াবাড়ি নয়? তবে কি তুমি কিছুই করবে না? করবে বই কি। কিন্তু তার আগে learn to understand or accept His will.

আর একটা কথা : সেই যে যৌগিক সাধনে পড়েছিলে, learn to discriminate between Will and Desire। Desire বা বাসনা হচ্ছে আমাদের আকুলি-বিকুলি—ওটা সাংখ্যের ভাষায় নিছক রজস্তমোবৃত্তি। তার চাইতে বড় জিনিষ হচ্ছে শুদ্ধসত্ত্বের সঙ্কল্প। সে-সঙ্কল্প হচ্ছে Pure Existence-এরই উল্টো পিঠ। He wills what IS. তিনি বললেন, Let there be light and there was light—কেননা, He *is* the Light. সুতরাং you can be only your own Self. এইজন্যই আগে নিজেকে জান ; তোমার জ্ঞান আপনি ঐশ্বর্যে বিচ্ছুরিত হয়ে পড়বে। তখন বুঝতে

পারবে, তুমি দেখ আর না দেখ, আদিত্যহ্যতি যেমন নিত্য বিচ্ছুরিত হয়ে এই পৃথিবীর ব্যাপারকে সক্রিয় রাখছে, তেমনি করে এ-জগতে তাঁরই ইচ্ছায় সব ঘটছে। সেই ইচ্ছাকে প্রত্যক্ষ করা এবং নিজেকে তার নিমিত্ত বলে অনুভব করা, এইটুকু মাত্র তোমার দায়। ইচ্ছার তীব্র সংবেগ, অচিতির মূঢ়তাকে প্রচণ্ড আঘাত হানা, বিশ্বের বেদনাকে বুকে তুলে নেওয়া, to suffer on the Cross—সবই সত্য; কিন্তু তবুও এগুলো অবিদ্যার রাজ্যের কথা। এই dynamism, fighting, suffering সবই একটা প্রহসন হবে যদি তার গভীরে ঐ চেতনা না থাকে যে you are willing only what IS; আর সেই অস্তিত্বের স্তব্ধতা তোমার সত্তার গভীরে তোমায় অবিচল না রাখে। এখানেও সেই এক আইন—তোমার সত্তার তিনভাগ নিজের মধ্যে গুটিয়ে থাকবে, শুধু তার একভাগ কর্মে ও বেদনায় বিচ্ছুরিত হবে। কিন্তু Divine Suffering কার নিয়তি? Only for the Son of God. আগে দিব্যোদ্বহিতা হও, তারপর বেদনা। I AM that I AM—তারপর Will.

এই গেল জগদ্ধিতের Will সম্পর্কে। আর একটা Will হচ্ছে about worldly affairs—শাস্ত্রে যেটাকে বলে যোগক্ষেমের ভাবনা। আমার দিন চলে যায় যাতে। এ-will যে ছাড়তেই হবে, তা বুঝতেই পারছ। যা ঘটবার তা ঘটবে, তুমি তার জন্য ব্যস্ত হবে কেন? এটা সোজা কথা, তা নিয়ে বিস্তার করব না।

তারপর Willএর আর একটা রূপ আছে—দৈনন্দিন কাজের সঙ্কল্প। এখানেও তটস্থ থাকতে হবে। মোটামুটি একটা খসড়া হয়তো করে রেখেছ, যতদূর তোমার দৃষ্টি যায় তাই দিয়ে দেখে।

ঘটনার ধারা হয়তো বেঁকে গেল—যাক্। প্রসন্নচিত্তে তাকে গ্রহণ কর। সবটাই তো খেলা। বারবার নিজের সেই যোগবিন্দুতে ফিরে যাও। অভ্যাসের ফলে দেখবে, প্রথমত নিজের ভিতরটা গুছিয়ে আসছে। তোমার যা সত্য-সঙ্কল্প তাই ঘটছে, কিন্তু একটু বাঁকাচোরা পথ নিয়ে হয়তো। প্রাণের স্রোত অমন এঁকেবেঁকেই বয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধারা গিয়ে ঠিক মহাসমুদ্রেই মেশে। এই গেল ভিতরের খবর। বাইরেও দেখবে, কিছুদিন পরে তোমার বাইরের জগৎও অন্তরের সেই সত্যসঙ্কল্পেরই অনুকূলে গুছিয়ে আসছে। এইটি একটু দেরিতে হয়, কিন্তু হয়। তোমার বাইরের জগৎ আর অন্তরের জগৎ দুটো মিলিয়ে তাঁরই শিল্পকর্ম। তিনি তোমাকে ফুলের মতই ফুটিয়ে তুলতে চান ; তুমি হাঁসফাঁস করে তাঁর ক্রিয়াকে বিলম্বিত কর।

তা হলে শেষ পর্যন্ত কথাটা এই দাঁড়াল, ভ্রূমধ্যবিন্দুতে স্থির থাক, কোনও সঙ্কল্প ভিতরে জাগতে দিও না। হুকুম আসবে—বাইরে থেকে হোক্ বা ভিতর থেকে হোক্, তুমি শুধু তা তামিল করে যাবে। কাজ শেষ হলেই আবার সেই ভ্রূমধ্যে গিয়ে তোমার টুলটিতে বসবে—যেমন তোমার চাপরাসি করে তোমার আপিসে। শঙ্করাচার্য একটি কথায় এটিকে বুঝিয়েছেন সুন্দর করে : 'নিরূপা চ নিরীহা চ নিত্যমেকান্তশীলতা'—No desire, no effort, always remaining within one's own self.

আর একটি কাজ হল প্রক্ষোভকে শান্ত করা। গীতার ভাষায় নির্দ্বন্দ্ব হওয়া। বাইরে থেকে আঘাত আসছে, তুমি বিচলিত হবে না। দুঃখে তোমার উদ্বেগ থাকবে না, সুখে তোমার স্পৃহা থাকবে

না। সব সময় মনে রেখো, আমাদের সব চাইতে বান্‌চাল করে দেয় সুখে। আধ্যাত্মিক মত্ততা থেকেও সুখ আসে, তাও আমাদের সর্বনাশ করে। গুরুকে নিয়ে মাতামাতি, আনন্দ-কোলাহল—দুদিন পরেই সব চুপ্‌সে গেল, রতি স্থিত হল না। এই মত্তটাকে আমরা অনেক সময় প্রশ্রয় দিই একটা ভাল জিনিস বলে, তাই এর কথাটা এখানে তুললাম। যেমন জগদ্ধিতের বাতিক, তেমনি এই গুরু নিয়ে নাচানাচি—দুটোতেই কিন্তু বিদ্যার মুখোস পরে অবিদ্যাই আসে ছলনা করতে। তাই বলি, সাধু সাবধান!

এই যে দুটি সংযমের কথা বললাম—গীতার একটি শ্লোকার্ধে শ্রীকৃষ্ণ সুন্দরভাবে এটিকে বুঝিয়েছেন—'নির্দ্বন্দ্বো নিত্যসত্ত্বস্থো নির্যোগক্ষেম আত্মবান্'—তোমার মাঝে (emotion-এর) দ্বন্দ্ব থাকবে না, তোমার মাঝে will আর effort-এর tension থাকবে না—তুমি থাকবে তোমার নিত্য ধ্রুববিন্দুতে, তুমি হবে আত্মবান্। এই হল ধারণার সাধনায় লৌকিক সিদ্ধি—অর্থাৎ সংসারে চলতে-ফিরতে আত্মকেন্দ্রে নিজেকে ধরে রাখা। দেখতেই পাচ্ছ, আমি ক্রিয়াযোগের (practical yoga) উপর জোর দিয়েছি বেশী। একান্তে অভ্যাস নিশ্চয় করবে, কিন্তু যোগকে দৈনন্দিন জীবনে না নামিয়ে আনতে পারলে সে তো পূর্ণ-যোগ হল না।

আচ্ছা, ধর, তোমার অবস্থা এখন এই দাঁড়িয়েছে: তোমার চলাফেরা সব ছন্দোময়, প্রাণায়াম তোমার পক্ষে সহজ, চিত্ত অন্তর্মুখ বলে সব সময় প্রসন্ন, আর দেহের কোনও একটা কেন্দ্রে তুমি সব সময় যোগস্থ থাকতে শিখেছ (যদি বিদেহ ধারণার অভ্যাস কর, তা হলে ধারণা হবে মাথার উপরে মহাশূন্যে—মূর্ধন্য চেতনায় সব সময় থাকা)।

এই যদি চলাফেরায়ও তোমার স্বাভাবিক অবস্থা হয়, তা হলে ধ্যানযোগ তোমার পক্ষে সহজ ও ক্ষেমঙ্কর হবে।

এখন তার কথা বলি। তার জন্য পতঞ্জলির পরিভাষায় 'সংযম' কাকে বলে, তা বুঝে নিতে হবে। সংযমের কথাই বলছি। যে কোনও বিষয়ে ধারণা, ধ্যান আর সমাধি যদি একসঙ্গে প্রবর্তিত হয়, তা হলে তার পারিভাষিক নাম হল 'সংযম' (সূত্র ৩/৪)। পতঞ্জলি বলেন, সংযম সিদ্ধির ফলে চিত্তে প্রজ্ঞার আলো ফোটে (সূত্র ৫)।

সমাধি-সূত্রের (সূত্র ৩) ব্যাখ্যার পরে সংযমের কথা আবার তুলতে হবে, এখানে শুধু এইটুকু লক্ষ্য করতে বলি, ধারণা-ধ্যান-সমাধি যোগের তিনটি অঙ্গ হলেও তিনটি মিলিয়ে একটি ব্যাপার। ধারণায় আত্মসত্তা নিবিড়ভাবে উদ্বুদ্ধ না হলে ধ্যান হয় না—এই কথাটি মনে রাখতে হবে। আর ধারণাতে এই আত্মসত্তার বোধ বস্তুত দেহচেতনারই সূক্ষ্ম ও স্বচ্ছ বোধ। কেন্দ্রে আর পরিধিতে যেখানেই হোক্ দৈহসত্তা আশ্রয় করে একটা স্বচ্ছ স্থৈর্যের অনুভব আনতে হবে—এই হল ধারণার মূল কথা। ধারণার দ্বারা উদ্বুদ্ধ এই আত্মবোধই হল ধ্যানের পটভূমিকা।

এই কথাটির গুরুত্ব খুব বেশী। ধ্যানের ফলে সমাধি এবং সমাধির ফলে প্রজ্ঞা—এ আমাদের জানা কথা। কিন্তু আধারকে তৈরী না করে ধ্যান করবার চেষ্টা করলে ওটা একটা ধস্তাধস্তির ব্যাপার হয়ে ওঠে। যোগের বহিরঙ্গে অর্থাৎ আসন-প্রাণায়াম-প্রত্যাহারে আধার তৈরী করবার যে-সঙ্কেত আছে, তার মধ্যে খানিকটা আয়াস আছে। আছে বলেই ওরা বহিরঙ্গ। অন্তরঙ্গ সাধনে যোগ অনায়াস হবে, সমাধি সহজ হবে, প্রজ্ঞার বিকিরণ স্বচ্ছন্দ হবে—এই হল যোগের

লক্ষ্য। প্রত্যাহার দ্বারা চিত্তকে অন্তর্মুখ করবার যে-প্রয়াস, তা যখন অনায়াস হয়ে একটি স্বচ্ছ দেহবোধের ধৃতিতে পর্যবসিত হবে, জানতে হবে তখনই ধ্যান-চিত্তের আবির্ভাবের সময় হয়েছে।

নৈয়ায়িকরা একটি কথা বলেন, 'মানাধীনা মেয়সিদ্ধিঃ' অর্থাৎ যা জানতে চাই, তাকে ঠিক ঠিক জানবার জন্য যা দিয়ে জানতে চাই সেই সাধনকে আগে ঠিক করে নিতে হবে। সব জানার শেষ কথা হল তাদাত্ম্যবোধ—যাকে জানছি তার সঙ্গে আমার তখন ভেদ থাকবে না। তখন জানতে হবে শুধু ইন্দ্রিয় দিয়ে নয়, মন দিয়েও নয়, আমার সত্তার সবখানি দিয়ে। আত্মসত্তাকে রিক্ত করতে পারলে এটি সম্ভব হয়; এ-ব্যাপারটি কিন্তু সাধারণভাবে জানার যে-ধরন তার একেবারে বিপরীত। চোখ দিয়ে একটা-কিছুকে জানতে গিয়ে আমরা তাকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখি অর্থাৎ চোখের শক্তিকে তীব্র ও একাগ্র করে তুলি। একাগ্রতার দ্বারা জ্ঞানের কেন্দ্রকে সঙ্কুচিত করে আনা যোগজ জ্ঞানের একটা অঙ্গ সন্দেহ নাই, কিন্তু ঠিক এই একাগ্রতার পিছনেই জ্ঞাতৃচেতনার একটি স্বচ্ছন্দ উদার ভূমিকা থাকা চাই, চেতনার অনায়াস ব্যাপ্তিতে আকাশের মত একটা প্রশান্ত ঔদার্যের ভাবনায় নিজেকে এলিয়ে দেবার কৌশলটুকু আয়ত্ত করা চাই, যাতে জ্ঞানের বিষয়টি স্বচ্ছন্দে তার মধ্যে ভেসে উঠতে পারে। বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা অথচ সেই সময়েই বিষয়ীর মাঝে একটা প্রশান্ত ব্যাপ্তির বোধ, এ না হলে ধ্যান অনায়াস হবে না। উপমা দিয়ে বলা যেতে পারে, সন্ধ্যার প্রশান্ত উদার আকাশে যেমন করে শুকতারা ফুটে ওঠে, ধৃতিযুক্ত চিত্তে ধ্যানের বিষয়টি তেমনি আপনা হতে ফুটে উঠবে, এই হল ধ্যানের আদর্শ। মন হয়তো ধ্যানের বিষয় নির্বাচন করে দেবে,

কিন্তু নির্বাচিত বিষয়ের প্রতি চিত্তের তীক্ষ্ণ একাগ্রতার ব্যাপারই ধ্যানযোগ হয়, এই কথাটি মনে রাখতে হবে। বিষয়ের প্রতি একাগ্রতা হল চিত্তের মাঝে প্রবৃত্তির ছন্দ; কিন্তু তারই পিছনে একটা নিবৃত্তির ছন্দও থাকা চাই। দুয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করতে পারাই হল অনায়াস ধ্যানযোগের রহস্য।

কথাটা তোমার কাছে পরিষ্কার করতে পারলাম কিনা জানি না। ধ্যান সম্পর্কে এই দৃষ্টিভঙ্গি সচরাচর আমরা দেখতে পাই না বলে বারবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার কথা বলতে হচ্ছে—যাতে ব্যাপারটাকে সহজে ধরতে পার। একটা দৃষ্টান্ত দিয়ে আবার বুঝিয়ে বলি।

মনে কর, কোনও দেবতার ধ্যান করছ। সাধারণত এই ধ্যান করা হয় রূপসংবিতের সাহায্যে। সামনে দেবতার ছবি বা মূর্তি আছে, তাকে চোখে দেখে আবার চোখ বুজে মনের মাঝে সেই রূপটি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টাকে আমরা বলি ধ্যান। চোখ বুজে কিছুই দেখতে পাচ্ছি না, কিন্তু স্মৃতিকে বারবার চেতিয়ে তুলে বাইরের রূপের একটা প্রতিচ্ছবি অন্তরে জাগিয়ে তুলতে চাইছি। অনেক-দিনের চেষ্টায় হয় তো ইষ্টমূর্তি হৃদয়ে ফুটল। প্রথম সে-মূর্তি চকিতে দেখা দিয়ে মিলিয়ে যেত, ক্রমে তা স্থির হল। চোখ বুজে অনেকক্ষণ পর্যন্ত তাকে এখন যেন হৃদয়ে দেখতে পাই। ক্রমে এই ধারণার মেয়াদ বাড়ল। অবশেষে চিত্ত তাতে তন্ময় হয়ে গেল, চিত্ত জুড়ে দেবতার মূর্তি ছাড়া আর কিছুই রইল না।

ব্যাপারটা বলতে যত সহজ, আসলে কিন্তু অত সহজ নয়।

১০

সালম্বন যোগ

ধ্যানের কথা হচ্ছিল। বলছিলাম, ধ্যানচিত্ত না হতে পারলে ধ্যান অনায়াস হয় না। একটা নির্দিষ্ট সময়ে একটা নির্দিষ্ট বিষয়ে যদি চিত্তকে তলিয়ে দিতে চাই, তা হলে তার জন্য সব সময়ের একটা উন্মুখীনতা এবং প্রস্তুতি থাকা দরকার। চলছি ফিরছি কাজ করছি কথা বলছি, কিন্তু তারই মাঝে ইষ্টস্মৃতিটুকু সজাগ রয়েছে—এমনি হওয়া চাই। রামকৃষ্ণদেব উপমা দিতেন—যেমন দাঁতের ব্যথা, সব-কিছুর মাঝে ওটি জেগে আছেই।

ইষ্টস্মৃতিকে এমনি করে জাগিয়ে রাখা খুব যে কঠিন, তা নয়। চেতনার দুটো ভাগ আছে। একটা মন, আর একটা বোধ বা বোধি। মনকে আমরা চিনি, তার চঞ্চলতা যে সাধনার পথে কত বড় বাধা, তাও জানি। সে-চঞ্চলতাকে দূর করে একটা কিছুতে মনকে নিবিষ্ট করতে গিয়ে কী যে গলদ্‌ঘর্ম হতে হয়, তাও দেখেছি। আর সাধারণতঃ এটাকেই আমরা বলি ধ্যানের প্রয়াস। কিন্তু ধ্যান মন দিয়ে করবার চেষ্টা না করে বোধ দিয়ে যদি করতে যাই, তাহলে সেটা সহজ হয়।

মন কাজ করে বৃত্তি নিয়ে, আর বোধ কাজ করে ভাব নিয়ে। বৃত্তিগুলি কাটা-কাটা, তাদের মুখ ফেরানো বাইরের দিকে। ভাব হল একরস বা একটানা, আর তার মুখ-ফেরানো ভিতরের দিকে। ধরা যাক্, কারও ওপর আমার রাগ হয়েছে। এই রাগটা একটা

ভাব। তার ক্রিয়া হচ্ছে সমস্ত দেহের উপর। আর এই ভাবকে আশ্রয় করে মনের মাঝে অনিষ্ট চিন্তার তরঙ্গ উঠেছে। এই তরঙ্গগুলি হল বৃত্তি। ভাব অপেক্ষাকৃত স্থির, কিন্তু বৃত্তিগুলি চঞ্চল। রাগের ভাবটা স্থায়ী হচ্ছে, বুকের মাঝে একটা জ্বলুনি যেন লেগেই আছে। কিন্তু চিন্তাগুলি তো স্থির থাকছে না, সেগুলি চারদিকে কেবল ছিট্‌কে-ছিট্‌কে পড়ছে। ভাব ক্রিয়ারূপ ধরতে গিয়ে অতি স্বাভাবিক নিয়মেই চিন্তার বিক্ষেপ সৃষ্টি করছে।

আমরা জানি, ধ্যান মানে চিত্তের একাগ্রতা। এখন ধ্যান করতে গিয়ে কিসের একাগ্রতা অবলম্বন করব—ভাবের না বৃত্তির? বৃত্তির বিক্ষেপটা রয়েছে চিত্তের সামনে। চিত্ত স্থির করতে গিয়ে আমরা সেটাকেই প্রথমে চেপে ধরি। ভুল হয় এইখানেই। একটা নালিশ প্রায়ই শুনতে পাই, আসনে বসে মন কিছুতেই স্থির হয় না, কেবল এদিক-ওদিক ছুটে বেড়ায়, যত-সব বাজে চিন্তা কি ঐ সময়টাতে আসে? কিন্তু ওটা তো মনের দোষ নয়, ঐ হচ্ছে তার স্বভাব। মন হল পেয়াদার মত। বুদ্ধি বা ভাবের হুকুমে সে ছুটাছুটি করবে, এটা-সেটা এনে প্রভুর কাছে হাজির করবে, এই তার কাজ। বুদ্ধি বা ভাব যতক্ষণ তৃপ্ত না হচ্ছে, ততক্ষণ সে ছোটাছুটি করবেই। প্রভু তৃপ্ত হলেই তারও কাজ ফুরিয়ে গেল।

মন যখন ছোটাছুটি করে তাকে জোর করে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করি, তখন এ কথাটা খেয়ালে আনি না। এই যে আসনে বসেছি, ভাব নিয়ে কি? একটু রতি, একটু প্রীতি, একটু ভালবাসা নিয়ে কি? ভালবাসি বিষয়কে, তাতেই রস পাই, সারাদিন তাই নিয়ে মেতে রয়েছি। সুতরাং আমার ভাবের আশ্রয় হল বিষয়। মন

ভাবের তাঁবেদার, সে বিষয়-চিন্তা ছাড়া আর কী করবে? ভাব নাই, অনুরাগ নাই, ব্যাকুলতা নাই, জোর করে কিংবা কর্তব্যবোধে দেহটাকে আসনে বসিয়ে দিয়ে মনকে হুকুম করলাম, তুই স্থির হয়ে যা। তার জন্য না হয় কিছু কসরতও করলাম। কিন্তু ভাব না জাগলে শুধু মুখের কথাতে সে স্থির হতে যাবে কেন?

প্রশ্ন হবে: তাহলে ভাব জাগবে কি করে? সোজাসুজি তার জবাব হয় না। চলতি কথায় বলে, 'ঘষে-মেজে রূপ আর ধরে-বেঁধে পিরীত'—এ হবার নয়। সময় না হলে চিত্ত বিষয় ছেড়ে তাঁকে চায় না। আবার চাওয়াটাও গোড়া থেকেই খুব স্পষ্ট হয় না বা জোর ধরে না। এ নিয়ে ভাগবতে একটি সুন্দর উপমা আছে। কাঠে আগুন থাকলেও তার প্রকাশ নাই। তারপর আগুনের ছোঁওয়ায় যদি-বা তাতে আগুন ধরল তো প্রথমটায় বেরুতে লাগল ধোঁয়া। ধোঁয়া কাটলে পর শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবে ব্রহ্মদর্শন সম্ভব হয়।

এই ধোঁয়ার সময়টাই সাধকের কাছে প্রাণান্তকর। আর এটা আসবেই। চিত্তের পাঁচটা ভূমির কথা আগে বলেছি। তার মাঝে একটা ক্রমিক পরিণাম আছে। মূঢ় চিত্ত তামসিক আঁধারে ছাওয়া। তাতে সত্ত্বের আলো ফোটাতে হলে মাঝখানটায় রজের ভূমি পার হতেই হবে। রজের ঘোর কাটলে পর সত্ত্ব জাগবে, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠা হতে আরও সময় লাগবে। সত্ত্ব শুদ্ধ হলে তবে চিত্ত একাগ্রভূমিক হবে। ইষ্টস্মৃতি তখন যেন একটা নেশার মত পেয়ে বসবে। নেশায় বুঁদ হয়ে গেলে চিত্ত নিরুদ্ধ হয়ে যাবে মাঝে-মাঝে। তখন একাগ্রতা আর নিরোধের মাঝে চলবে একটা বাচ্‌খেলার মত। ক্রমে নিরোধের সংস্কার পাকা হয়ে চিত্তের পিছনে একটা অবর্ণ

শূন্যতার পটভূমি রচনা করবে, আর তারই বুকে চলবে আলোর খেলা।

মূঢ়তা থেকে শুদ্ধসত্ত্বে উত্তীর্ণ হতে হলে রজোভূমি পার হতেই হবে—এটা গোড়া থেকেই জেনে রাখা ভাল। অনেক ঝামেলার জন্য সাধককে প্রস্তুত থাকতে হয়। কোন অবস্থাতেই হাল ছেড়ে দিলে চলবে না। ঝিনুক দিয়ে সমুদ্র ছেঁচবার পণ নিয়ে তবে সাধনায় নামতে হবে। গীতা তাই বলছেন: 'নিশ্চয়েন যোক্তব্যো অনির্বিণ্ণেন চেতসা'—যোগ করতে হবে একটা দৃঢ়সংকল্প নিয়ে, মনমরা ভাবকে একদম আমল না দিয়ে। পতঞ্জলি বলছেন, দীর্ঘকাল ধরে একটুকুও ফাঁক না রেখে সমান উৎসাহ নিয়ে যদি সাধনা করে যাও, তা হলে যোগের ভূমি পোক্ত হবে। রামকৃষ্ণদেব বলতেন, সাধনা করতে হবে রোখ নিয়ে, ওটা ভ্যাতভ্যাতে চিড়ের ফলার হলে চলবে না। বুদ্ধদেব বলতেন, সাধনা করবে শ্রদ্ধা আর বীর্য নিয়ে; আমার হবেই হবে, এই ভাবের নাম হল শ্রদ্ধা, আর হাজার বাধাতেও কিছুতেই পিছপা হব না, এই জোর হল বীর্য। উপনিষদে বলেন, 'নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ'—যে বলহীন সে কখনও এই আত্মাকে পায় না।

সংকল্পের দৃঢ়তা আর তা হতে একটা তীব্র সংবেগ—লক্ষ্যে আমাকে পৌঁছতেই হবে, নদী যেমন পাহাড় কেটে হলেও সমুদ্রের দিকে ছোটে তেমনি করে আমায় ছুটতে হবে—এমনিতর দুর্বার একটা চিত্তবেগ নিয়ে সাধনায় নামতে হবে। সংকল্পই হল সাধনার ভিত্তি। সংকল্প যত দৃঢ় হবে, ভাব ততই শুদ্ধ হবে, জমাট হবে। একটু-না-একটু ভাবের পুঁজি সবার থাকেই, না হলে সাধনায় রুচি হত না। কিন্তু ভাব প্রথমটায় বাষ্পের মত ছড়িয়ে থাকে, তাকে

খাতবন্দী না করলে শক্তির প্রকাশ হয় না। সংকল্পে মেরুদণ্ড সটান হয়। যোগের ভাষায় বলতে গেলে, জালন্ধরবন্ধের টানে নাড়ীজাল ঊর্ধ্বস্রোতা হয়ে বিশুদ্ধপদ্মের কেন্দ্রে এসে সংহত হয়, আর হৃদয়পদ্ম হতে ভাবও ঊর্ধ্বমুখ আভাস্বরতায় ঐখানে গিয়ে তার সঙ্গে সঙ্গত হয়। ভাব আর সংকল্পের (Emotion and Will) সঙ্গমই হল যোগশক্তির উৎস।

চিত্তের তিনটি মুখ্য বৃত্তি—ভাব, সংকল্প আর জ্ঞান। সাংখ্যের সঙ্কেত অনুযায়ী বলতে পারি, ভাব আর সংকল্প প্রকৃতির এলাকায়, আর জ্ঞান পুরুষের এলাকায়। কিন্তু তিনটি বৃত্তিই ওতপ্রোত, কেননা প্রকৃতি পুরুষেরই স্বীয়া প্রকৃতি, তাঁরই আত্মশক্তি, সুতরাং প্রাকৃত বৃত্তি পৌরুষেয় বৃত্তিরই আশ্রিত। ধারণার সঙ্গে ধ্যানের সঙ্গতি রেখে বলা চলে, তিনটি বৃত্তির তিনটি ক্রিয়াস্থান আছে। ভাবের স্থান হল হৃদয়ে অনাহতচক্রে ; সংকল্পের স্থান কণ্ঠের একটু উপরে চোয়ালের পিছন দিকটায় বিশুদ্ধচক্রে ; আর জ্ঞানের স্থান ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্রে। বলা বাহুল্য, জ্ঞান আর-দুটি বৃত্তির নিয়ামক।

স্বস্থানে প্রত্যেক বৃত্তিরই ক্রিয়া অবাধিত স্বচ্ছন্দ এবং শুদ্ধ সত্ত্বময়। বৃত্তির বিশুদ্ধ স্বভাবের বোধকে চেতনায় স্পষ্ট করবার জন্য ঐ সব স্থানে চিত্তকে ধারণার নিয়মানুযায়ী কিছুক্ষণ ধরে বেঁধে রাখবার অভ্যাস করা ভাল।

চিত্তকে বাঁধবার জন্য একটা প্রত্যয়ের আলম্বন দরকার। এক্ষেত্রে সব চাইতে ভাল আলম্বন হচ্ছে আকাশপ্রত্যয় বা শূন্যতার ভাবনা। প্রাচীন যোগে এই ভাবনাকেই সব চেয়ে প্রশস্ত মনে করা হত। তার কারণও আছে। প্রথমতঃ, আকাশের ভাবনায়

চেতনার ব্যাপ্তি আপনা থেকেই এসে যায়। ব্যাপ্তির বিপরীত হল সঙ্কোচ। চেতনার ব্যাপ্তিতে আরাম, আর সঙ্কোচে ব্যারাম। সংসারের ঘাত-প্রতিঘাতে আমরা কুঁকড়ে যাই, তাতে আমাদের চেতনা ক্লিষ্ট হয়, নাড়ীতন্ত্রের মাঝে সব সময় থাকে একটা টান-টান ভাব। আকাশ-ভাবনায় এই টানটা দূর হয়ে যায়, দেহ-প্রাণ-মন আল্‌গা করে দেওয়ার আরামে চেতনা স্বস্থ হয়।

দ্বিতীয়তঃ আকাশ-ভাবনায় চিত্ত যে বিশ্রাম পায়, তা-ই কিন্তু হয় তার শক্তির উৎস। চিত্তে শক্তির প্রকাশ হয় প্রবৃত্তি আর নিবৃত্তি দুয়েতেই। প্রবৃত্তি হল সামনের দিকে ছোটা, আর নিবৃত্তি হল গুটিয়ে আসা। নিবৃত্তি যদি প্রবৃত্তির রাশ না টেনে ধরে, তা হলে শক্তির উত্তেজনা খুব তাড়াতাড়ি অবসাদে ঝিমিয়ে পড়ে। এই ঝিমিয়ে-পড়াটাও নিবৃত্তি, কিন্তু তার মাঝে প্রবৃত্তির পূর্ণ চরিতার্থতা ঘটে না বলে একটা অতৃপ্তি থেকেই যায়। তাইতে আবার প্রবৃত্তির উত্তেজনা, আবার অবসাদ, আবার উত্তেজনা—এমনিতর একটা যান্ত্রিক পৌনঃপুনিকতা চলতে থাকে। এটাই চিত্তের চাঞ্চল্যের একটা প্রধান কারণ।

কিন্তু বস্তুতঃ প্রবৃত্তির স্ফুরণ হয় তার পিছনকার একটা বিরাট শূন্যতা হতে। চিত্তের মাঝে ভাবনা-বেদনা-বাসনার বুদ্‌বুদ্‌ অনবরত ফুটছে—যেমন সমুদ্রের বুকে বুদ্‌বুদ্‌ ফোটে। আমরা শুধু বুদ্‌বুদ্‌-গুলিকেই দেখি, সমুদ্রটাকে দেখি না। আকাশভাবনায় চিত্ত সমুদ্র-সচেতন হয়। সমুদ্রটা হল বোধিচেতনা, যার কথা আগে বলেছি; আর বুদ্‌বুদ্‌গুলি মনশ্চেতনা। সাংখ্যের পরিভাষা ব্যবহার করে বলতে পারি—একটা পুরুষ, আরেকটি প্রকৃতি। প্রকৃতির ক্রিয়া

চলছে চলুক। কিন্তু তাকে ছাপিয়ে পুরুষের বোধিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। জাগিয়ে তোলা যায়, একটু স্থির থেকে সর্বদেহময় স্বচ্ছন্দ প্রাণনের যে একটা একরসপ্রত্যয় রয়েছে তাকে আঁকড়ে ধরে। সমস্ত দেহটাকে নিশ্চল এবং শিথিল করে দিয়ে শবাসনে শুয়ে থাকলে যে-বোধ জাগে তাকেই বলতে পারি প্রাণনের ঐ একরস-প্রত্যয়। একটু অভ্যাস করলেই তার স্মৃতিকে চেতনায় সব সময় জাগিয়ে রাখা অসম্ভব হয় না। এই বোধটাই আকাশ বা সমুদ্র। বৈদিক ঋষিরা বলেছেন, হার্দাকাশ বা হৃত্সমুদ্রের কথা। আকাশ বা সমুদ্রের ব্যাপ্তিচেতনার আধার করা হয়েছে হৃদয়কে। কেননা, হৃদয়ে ব্যাপ্তিচেতনা খুব সহজে জমাট বাঁধে। অথচ হৃদয়টা ফাঁকা; ফুট ফুটছে, বুদ্‌বুদ্‌ উঠছে ঐ ফাঁকা থেকেই। আমি হেলান দিয়ে রয়েছি ঐ শূন্যে—বুদ্‌বুদের সঙ্গে-সঙ্গে বাইরে ছুটছি না।

রামকৃষ্ণদেবকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: 'ধ্যান করব কোথায়?' তিনি বলেছিলেন: 'কেন হৃদয়ে করবি, হৃদয় হল ডঙ্কামারা জায়গা।' অধিকাংশ সাধকের পক্ষেই চিত্তকে বাঁধবার সব চাইতে প্রশস্ত জায়গা হল হৃদয়,—কেননা, হৃদয় ভাবস্থান, আর ভাবকে অবলম্বন করেই প্রাকৃত-চেতনা সাধারণতঃ প্রদীপ্ত হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু হৃদয়ে চিত্তকে বাঁধতে গিয়েও সর্বদেহব্যাপী বোধকে করতে হবে তার আধার। যেমন কালবন্ধের বেলায়, তেমনি দেশবন্ধের বেলাতেও বিন্দুচেতনা আর ব্যাপ্তিচেতনা দুয়ের দিকেই সমান নজর রাখতে হবে। যেমন নির্দিষ্ট সময়ে তন্ময়তা আনতে হলে সব সময় তন্ময়তার একটা ভাব জাগিয়ে রাখার কথা আগে বলেছি, এক্ষেত্রেও ঐ একই নিয়ম। হৃদয়ের শূন্যতা ঘনীভূত হয়ে যেন সর্বদেহের শূন্যতাকে

আহরণ করে। বরং সর্বদেহব্যাপী শূন্যতার ভাবটাকেই আগে আনা দরকার।

গোড়াতেই বহিরঙ্গ যোগের কথা বলতে গিয়ে বলেছিলাম আসনের কথা, বলেছিলাম তার দুটি প্রধান সাধন—প্রযত্নশৈথিল্য আর অনন্তসমাপত্তি। এখন এই দুটি সাধন হল যে-কোনও দেশবন্ধের ভিত্তি। সর্বশরীরব্যাপী বোধকে শিথিল করে হাল্‌কা করে বর্তুলাকারে অনন্তে ছড়িয়ে দিতে হবে, আর এই বর্তুলতার কেন্দ্র করতে হবে হৃদয়কে। তারপর শ্বাস-প্রশ্বাসের মাঝে যেমন একটা সঙ্কোচ-প্রসারের স্বাভাবিক ছন্দ আছে, তেমনি হৃদয় থেকেই চেতনার সঙ্কোচ-প্রসারের একটা ছন্দ জাগিয়ে শূন্যতার ভাবনাকে প্রবর্তিত করতে হবে। উপনিষদের ঋষি বলছেন: 'এই হৃদয়ের মাঝে যে-আকাশ, সে ছাপিয়ে গেছে পৃথিবীকে, ছাপিয়ে গেছে দ্যুলোককে।' এই কথাটার মাঝেই ঐ সাধনার সঙ্কেত রয়েছে। হৃদয়ের আকাশেই দ্যুলোক-ভূলোকের আকাশ গুটিয়ে আসছে, আবার হৃদয় হতেই দ্যুলোক-ভূলোকে তা ছড়িয়ে পড়ছে। ভাবনার সুবিধার জন্য হৃদয়ে একটা জ্যোতির্বিম্ব—যেমন সূর্যবিম্ব বা চন্দ্রবিম্বের মত—ধারণা করাও চলে। ভাবনার সঙ্কোচ-প্রসারের ছন্দের সঙ্গে-সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাসের ছন্দকে মিলিয়ে নিতে পারলে আরও ভাল। মহাকাশ হতে হার্দাকাশে গুটিয়ে আসছি নিঃশ্বাসে বা অপানশক্তিতে, আবার ছড়িয়ে পড়ছি প্রশ্বাসে বা প্রাণশক্তিতে—ভাবনা করতে হবে এই ছন্দে।

এইখানে একটা কথা বলে রাখি। আমাদের মাঝে রূপের সংস্কার প্রবল, তাই হৃদয়ে ইষ্টমূর্তির দর্শন পাওয়াকে আমরা একটা পরম আকাঙ্ক্ষার বিষয় মনে করি। হৃদয়ে ইষ্টমূর্তির 'চিন্তা' তাই

আমাদের মাঝে বহুপ্রচলিত একটা সাধন-পদ্ধতি। কিন্তু প্রায়ই দেখা যায়, চিন্তায় মূর্তি আসছে না, এলেও স্পষ্ট হচ্ছে না বা সম্পূর্ণ হয়ে ফুটছে না। কেন এ সব হয়, তা বোঝা কঠিন নয়। এখানেও সেই একই কথা: ভাবে যাকে সহজে পাওয়া যেত, তাকে চিন্তায় পেতে গিয়ে গলদ্‌ঘর্ম হওয়া। রূপকে আঁকড়ে ধরবার চেষ্টা না করে অরূপের ভূমি থেকে তাকে ফুটতে দিলে তা যেমন সহজে আসে, তেমনি স্থায়ীও হয়, উপরন্তু ভাব আর রূপের দ্বন্দ্বও তাতে মিটে যায়। তখন ভাবের বুকে চলতে থাকে রূপ আর অরূপের লীলা। রূপ আসে-যায়, কিন্তু ভাবের ভূমিকা স্থির থাকে বলে অভাবের বেদনা তখন সইতে হয় না।

আর ভাবের বনিয়াদ হল আত্মভাব। আগে নিজের ভাবশুদ্ধি দরকার, তবে না ইষ্টের ধারণা সহজ হবে! আর নিজের ভাবশুদ্ধির অর্থই হল আকাশের মত ফাঁকা হয়ে যাওয়া। পূর্ণকে পাওয়ার জন্যই এমনি করে শূন্য হওয়া। সেই শূন্যের মাঝে বাসনার সংস্কার, আপনা থেকে তখন রূপের আলো ফুটিয়ে তোলে। সমস্ত যোগ-সাধনারই এই হল মূল সূত্র—সব ছেড়ে তবে সব পাওয়া।

১১

নিরালম্ব যোগ ঃ নিদ্রাযোগ

বলছিলাম ধ্যানযোগের গোড়াতেই চিত্তের বৃত্তি আর ভাবের মধ্যে তফাত করতে শিখতে হবে। বৃত্তি বিক্ষিপ্ত, ভাব একরস। কিন্তু বৃত্তির বিক্ষেপ সত্ত্বেও একটা-না-একটা ভাব সব সময় চিত্তকে ছেয়ে থাকছেই—হয় আনন্দ, নয় অস্বস্তি, নয় তো অবসাদ। প্রাকৃত চেতনায় এগুলিই বৃত্তির পটভূমি। অপ্রাকৃত চেতনায় প্রকাশিত হয় শুদ্ধ ভাব। তার স্বরূপ হল অধ্যাত্মপ্রসাদ—অস্বস্তিও নয়, অবসাদও নয়।

ভাবেরও পিছনে আছে শূন্যতা। একরসপ্রত্যয়ের সেই হল আশ্রয়। যেমন বৃত্তিনিরোধের দ্বারা শূন্যতায় পৌঁছন যায়, তেমনি ভাবের শুদ্ধি ও উদ্দীপন দ্বারাও পৌঁছন যায়। শূন্যতায় না পৌঁছান পর্যন্ত বস্তুলাভ সম্পূর্ণ হয় না। কিছুই যেখানে নাই, সেইখান থেকেই সব উছলে পড়ছে—এই বোধই পরম বোধ।

স্বভাবের নিয়মে চিত্ত বৃত্তিশূন্য হয়ে যেতে পারে—যেমন অবসাদ, আচ্ছন্নতায় বা ঘুমে। চিত্তের উন্মেষদশাতেও তা বৃত্তিশূন্য—যেমন শিশুর চিত্ত। কিন্তু এসব চিত্তের প্রত্যেকটিতেই বিক্ষেপের বীজ থাকে। তাই বৃত্তিশূন্যতা স্থায়ী হয় না বা তার ফলে চেতনার উৎকর্ষ ঘটে না।

বিক্ষেপ চিত্তের মাঝে একটা আবর্তের সৃষ্টি করে। আবর্তের বাইরে যে মহাসমুদ্রের প্রশান্তি আছে তা তখন বোধে আসে না।

এইটাই তমোগুণ বা আবরণ-শক্তির ক্রিয়া। প্রাকৃত বৃত্তিশূন্যতা তাই যোগভূমি নয়। যোগে বৃত্তি না থাকলেও বোধ উদ্দীপ্ত থাকবে। সে বোধ অন্তরাবৃত্ত এবং আত্মনিষ্ঠ। সব সময় হুঁশে থাকা যুক্তচিত্তের একটা বিশেষ লক্ষণ।

কিন্তু প্রাকৃত বৃত্তিশূন্যতাকেও যোগের কাজে লাগানো যেতে পারে। বৃত্তির স্পন্দন চলছে যখন, তখন যেমন হুঁশে আছি, তেমনি স্পন্দন মন্থর হয়ে থামবার মুখেও হুঁশে থাকব। মেঘ এসে আচমকা না ছেয়ে ফেললে দিনের আলো ধীরে ধীরেই নিবে আসে। আলো আর আঁধারের একটা সন্ধিক্ষণ থাকে। চেতনার আলো-আঁধারেরও এই নিয়ম। যেমন জাগ্রৎ আর নিদ্রার সন্ধিকাল। একটু চেষ্টাতেই এটাকে দীর্ঘ করা যেতে পারে। চিত্ত স্বভাবতই ঘুমের সময় বৃত্তি-শূন্যতার দিকে ঝোঁকে; এই ঝোঁকটাকে রয়ে-সয়ে আসতে দিতে হয়। ফুঁ দিয়ে প্রদীপ নেবানো নয়, ধীরে ধীরে সন্ধ্যার বুকে মিলিয়ে যাওয়ার মত করে ঘুমিয়ে পড়া। শিশু যেমন মায়ের বুকে ঘুমিয়ে পড়ে।

না, উপমাটা পূর্ণ হল না। শিশু ঘুমিয়ে পড়ে, কিন্তু মা জেগে থাকেন। মায়ের জেগে থাকার আশ্বাস হয় তো শিশুর মাঝে আছে, কিন্তু তার বোধ তার মাঝে স্পষ্ট নয়। যোগনিদ্রায় এই বোধটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

নিদ্রা যেন মায়ের যোগিনীহৃদয়। গভীর নিশীথে পৃথিবী ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু লক্ষ তারার অপলক দৃষ্টি নিয়ে নিস্তব্ধ আকাশ তখনও জেগে আছে। ঐ আকাশই মায়ের হৃদয়। ওখানে ঘুমানোর অর্থ ই হল ঐ পরম প্রশান্তির মাঝে জেগে ওঠা। জেগে ওঠা ধীরে

ধীরে। যেমন সন্ধ্যার আঁধারকে তরল করে চাঁদ ওঠে, জ্যোৎস্না ফোটে, তেমনি করে।

নিদ্রার অর্থ প্রলয় নয়, অজানার রাহুগ্রাস নয়। জাগ্রতের স্তব্ধতা দিয়ে নিদ্রাকে চিনি। তাই তাকে আবাহন করে আনি, তার মাঝে চেতনাকে প্রসারিত করে দিই, বিছিয়ে দিই মায়ের যোগিনীহৃদয়ে।

এমনি করে ঘুমেরও রূপান্তর ঘটানো যায়। যোগীরা বলেন, নিদ্রা পাঁচ রকমের—তামসী, রাজসী, সাত্ত্বিকী এই তিনটি গুণময়ী নিদ্রা ; তারও পরে আছে অপ্রাকৃত গোপীনিদ্রা, আর যোগনিদ্রা। ঘুমিয়ে আশ মিটছে না, ঘুমের পরও জড়ত্ব কাটছে না, মনটা বোবা হয়ে গেছে—এ হল তামসী নিদ্রার ফল। ভাল ঘুম হল না, নানা হিজিবিজি স্বপ্নে রাত কেটে গেল, জেগে উঠেও চিত্তে একটা ছট্‌ফটানির ভাব—এটা রাজসী নিদ্রার লক্ষণ। আর স্বপ্নশূন্য পরিপূর্ণ নিদ্রা, অল্প সময়ের জন্য হলেও তাতেই একটা পরম তৃপ্তি, জেগে ওঠাটা যেন ভোরের আকাশে উষার আলো ফোটার মত—এটা হল সাত্ত্বিকী নিদ্রা। এ নিদ্রা সম্ভব হতে পারে, যদি তাকে মায়ের যোগিনীহৃদয়ের ভাবনার দ্বারা আবাহন করে আনতে পারি।

'নিদ্রা সমাধিস্থিতিঃ'—এইটি হল সাধনার সূত্র। ধ্যানের মাঝে জোর করে বৃত্তি-নিরোধ করতে চাই, কিন্তু ঘুমের মাঝে বৃত্তি-নিরোধ তো আপনা হতেই হয়ে যাচ্ছে। নিদ্রাকে আমি স্বচ্ছন্দে প্রবর্তিত করতে পারি না বলেই চেতনা তার মাঝে অন্ধতমিস্রায় ডুবে যায় বা অবাঞ্ছিত বিক্ষেপে উদ্বেজিত হয়ে ওঠে। অথচ নিদ্রার লক্ষ্য

প্রশান্তি, চিত্তের মহাকারণে প্রবোধন। এই মহাকারণই মা, উপনিষদের ভাষায় যিনি সর্বেশ্বরী সর্বযোনি, আনন্দভুক্।

নিদ্রা এই মায়েরই আবাহন। এ-ও একটা যোগ, যোগাঙ্গগুলি এরও মধ্যে সুকৌশলে প্রয়োগ করা যেতে পারে। শবাসনে নিস্পন্দ হয়ে শুয়ে প্রযত্নশৈথিল্যের দ্বারা দেহবোধকে লঘু বাষ্পের মত ছড়িয়ে দাও। তারপর শ্বাসের প্রতি কিছুক্ষণ লক্ষ্য রাখ, শ্বাস মৃদু পরিপূর্ণ এবং ছন্দোময় হোক। সেই সঙ্গে হংস-বীজের তালে তালে জপ চলুক। এইটি প্রাণায়াম। সঙ্গে সঙ্গে অনন্তশায়ী নারায়ণের ভাবটি নিজের উপর আরোপ কর। শয্যা নয়, অনন্তজ্যোতির্ময় কারণসমুদ্র। মেরুদণ্ডটি একটি বিদ্যুন্ময় স্পর্শবোধ হয়ে তার মাঝে ভাসছে। সমস্ত চেতনা গুটিয়ে আসছে হৃদয়ে। সেখান থেকে অনির্বচনীয় স্পর্শ স্রোত হয়ে উজিয়ে চলছে কণ্ঠে, ভ্রূমধ্যে, মস্তকে, মহাশূন্যে। উপরে-নীচে ডাইনে-বাঁয়ে নিরালম্ব আকাশের মহারিক্ততা। মা নামছেন, যোগনিদ্রারূপে হৃদয় হতে উত্তরবাহিনী প্রাণগঙ্গা হয়ে প্রবাহিত হচ্ছেন মূর্ধন্যচৈতন্যের পানে। এইটি প্রত্যাহার এবং ধারণা।

এমনি করেই নিদ্রার রূপান্তর ঘটে। অবোধের মাঝে বোধ জাগে। অনির্বচনীয় অব্যক্তের বোধ। উপনিষদের ঋষি তাকে বলেন 'সম্প্রসাদ' কিনা চেতনার জ্যোছনামধুর স্বচ্ছতা। এ হল মায়ের আনন্দরূপ—বালিকার মত। নিদ্রা তখন শুদ্ধসত্ত্বময়ী। জ্যোছনা গাঢ়তর হয়, জাগে ভাবের উল্লাস, চিৎসমুদ্রে ঢেউ ওঠে। মা তখন কিশোরী। নিদ্রা গোপীনিদ্রা। আবার চেতনার বিস্ফোরণও ঘটে, আকাশে জ্বলে ওঠে মহাসূর্য। মা তখন তরুণী সাবিত্রী। নিদ্রা যোগনিদ্রা। এমনি করে 'যা নিশা সর্বভূতানাং তস্যাং জাগর্তি সংযমী।'

সারাদিন কর্মব্যস্ততায় কাটে। বলি, তোমাকে ডাকবার সময় পাই না। একদণ্ড সুস্থ হয়ে বসে তোমাকে ডাকব, তার সময় কই? তাই তোমায় ভুলে থাকি।

কিন্তু মা ভোলেন না। প্রতিদিন নিশীথের গভীরে আমার কর্মব্যস্ত ভাবনামুখর জগতের প্রলয় ঘটান, পরম মমতায় টেনে নেন তাঁর যোগিনীহৃদয়ের অতলে। হৃদয়ে হৃদয়, 'জ্ঞানপ্রবাহা বিমলাদিগঙ্গা' উত্তরবাহিনী। আমি যদি না-ও জানি, মা জানেন।

আর কিছু না দিতে পারি, যদি ঘুমটিও তাঁকে দিতে পারতাম, যদি বলতে পারতাম: 'আমার শয়নে প্রণাম জ্ঞান, নিদ্রায় করি তোরই ধ্যান'!

———

শ্রীমৎ-অনির্বাণ রচিত

গ্রন্থ-তালিকা

(১) **দিব্য-জীবন :** (শ্রীঅরবিন্দ-রচিত **Life Divine**-এর বঙ্গানুবাদ)
(৩ খণ্ড) 'অরবিন্দ-আশ্রম' কর্তৃক প্রকাশিত

(২) **দিব্যজীবন-প্রসঙ্গ :** ('অরবিন্দ পাঠমন্দির' কর্তৃক প্রকাশিত)

(৩) **যোগসমন্বয়-প্রসঙ্গ :** (" " " ")

(৪) **কাবেরী :** কবিতাবলী (" " " ")

(৫) **বেদ-মীমাংসা :** ('সংস্কৃত কলেজ' হইতে প্রকাশিত)
(৩ খণ্ড)

(৬) **উপনিষৎ-প্রসঙ্গ** (১ম) **: ঈশোপনিষদ্ :** ('বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়' কর্তৃক প্রকাশিত)

(৭) " " (২য়) **: ঐতরেয় উপনিষদ্** " "

(৮) " " (৩য়) **: কেনোপনিষদ্ :** (হৈমবতী গ্রন্থমালা)

(৯) **প্রবচন** (৪ খণ্ড) **:** পত্রাবলী (প্রকাশক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী)

(১০) **পত্রলেখা** (২ খণ্ড) " " " "
" (৩ খণ্ড) " (প্রকাশিকা—শ্রীরমা চৌধুরী)

(১১) **গীতানুবচন** (৩ খণ্ড) **:** " (প্রকাশক—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ব্যানার্জী)

(১২) **স্নেহাশিস্** (৩ খণ্ড) **:** " " " "

(১৩) **প্রশ্নোত্তরী :** " " " "

(১৪) **দক্ষিণামূর্তি :** " " " "

(১৫) **বেদান্তজিজ্ঞাসা :** " " " "

(১৬) **শিক্ষা** ("আসাম-বঙ্গীয় সারস্বত মঠ" কর্তৃক প্রকাশিত)

পরিবেশক—**"হৈমবতী প্রকাশনী"**, (১) ৯/২ ফার্ন রোড, কলিকাতা-১৯
এবং (২) **"উদয়-সংঘ"**, ১৭ বারুইপাড়া লেন, হাওড়া-৪
প্রধান বিক্রেতা—**মহেশ লাইব্রেরী**, ২/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭৩ এবং অন্যান্য সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়।

हिमवत